সেকুলারিজম, ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক

তিউনিশিয়ার অভিজ্ঞতা

সেকুলারিজম, ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক

তিউনিশিয়ার অভিজ্ঞতা

সম্পাদনা

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

সিএসসিএস পাবলিকেশন্স

CSCS

সমাজ ও সংস্কৃতি অধ্যয়ন কেন্দ্র

সেকুলারিজম, ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক
তিউনিশিয়ার অভিজ্ঞতা

সম্পাদনা: মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল ২০২৩

প্রকাশক
সিএসসিএস পাবলিকেশন্স
কার্যালয় (অস্থায়ী):
এসই— ১৫, দক্ষিণ ক্যাম্পাস,
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম-৪৩৩১।
ফোন: ০১৯৫৩ ৩২৩০৩০
ইমেইল: contact@cscsbd.com
ওয়েবসাইট: cscsbd.com

স্বত্ব
সিএসসিএস পাবলিকেশন্স

নির্ধারিত মূল্য
২৭০ টাকা মাত্র

Secularism, Dhormo Ebong Rastrer Shomporko: Tunisiar Oviggota (Secularism, Religion and State: Tunisian Experience), Edited by Mohammad Mozammel Hoque, Published by CSCS Publications, South Campus, University of Chittagong. First published: April 2023. Copyright © CSCS Publications. BDT 270 only.

আধ্যাত্মিকতার ভাবলুতা হতে মুক্ত হয়ে
অথচ নিছক আল্লাহর ওয়াস্তে
যারা একবিংশ শতাব্দীর এই অভিনব বৈশ্বিক বাস্তবতায়
রাজনীতির মাধ্যমে সোশ্যাল ওয়ার্ক করতে চান
হতে চান সফল
তাদেরই জন্যে এই সংকলন

ভূমিকা

সেকুলারিজম, ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক: তিউনিশিয়ার অভিজ্ঞতা – এই বইটিতে সমকালীন তিউনিশিয়ায় 'ইসলামী আন্দোলনে'র বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তিউনিশিয়ান মডেল ভাল কি মন্দ, তা বিবেচনার ভার আমরা পাঠকদের ওপর ছেড়ে দিয়েছি। সেখানে বাস্তবিকপক্ষে যা ঘটেছে তার প্রেক্ষাপট বুঝার জন্য বইটি সহায়ক হবে। প্রবন্ধ, বক্তৃতা ও সাক্ষাৎকার নিয়ে এই গ্রন্থে এগারোটি লেখা আছে। একটি বাদে সবগুলো লেখা ইংরেজী থেকে অনুবাদ। সিএসসিএস-এর সাইটে ২০১৩'র শেষের দিক হতে তিউনিশিয়া নিয়ে আমরা এই লেখাগুলো প্রকাশ করা শুরু করি।

সমাজ ও সংস্কৃতি অধ্যয়ন কেন্দ্র (সিএসসিএস) এর তৎকালীন নির্বাহী পরিচালক জনাব মাসউদুল আলম, সেন্টারের প্রাক্তন গবেষণা সহকারী জনাব মো. হাবিবুর রহমান হাবীব, কেন্দ্রের প্রাক্তন গবেষণা সহকারী জনাব মো. আইয়ূব আলী, অনুবাদের গুরু দায়িত্বপালন করার জন্য তোমাদেরকে ধন্যবাদ। আমাদের সুধী জনাব আবু সুলাইমান অনুবাদ করেছেন ১টি লেখা। আপনার জন্যও রইল শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা।

ইসলাম প্রশ্নকে সামনে রেখে রাজনৈতিক অঙ্গনে যারা কিছু একটা করতে চায় তাদের জন্য আরব বসন্ত পরবর্তী তিউনিশিয়ায় কী হলো, কীভাবে হলো, তা নিয়ে অনেক কৌতুহল, উৎকণ্ঠা-উদ্বেগ এবং অনিবার্যভাবে গড়ে উঠা অনেক ভুলবুঝাবুঝি। এমন নয় যে এই বই পড়ে তা সব মিটে যাবে। তবে এটি নিশ্চিত, এতে আপনি অনেক প্রশ্নের উত্তর কিংবা উত্তর পাওয়ার পথ খুঁজে পাবেন। এক কথায়, পলিটিক্যাল ইসলামকে যারা ডিল করতে চান, তাদের জন্য এই বইটি নিঃসন্দেহে সহায়ক।

২০১৭ সালের জানুয়ারির পর হতে সাম্প্রতিক সময়ে তিউনিশিয়ায় আরো বিচিত্র ও অভাবনীয় পথে নানা ধরনের ঘটনা ঘটেছে। রাজনীতির ময়দান সদা পরিবর্তনশীল। দৈনিক সংবাদ পত্র ব্যতিরেকে এতকিছু ফলোআপ করা অসম্ভব। প্রবন্ধগুলোকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে অনেকখানি বিলম্ব হলো। এটি আমাদের সীমাবদ্ধতা।

তিউনিশিয়া নিয়ে সমাজ ও সংস্কৃতি অধ্যয়ন কেন্দ্রের আগ্রহের কারণ বাংলাদেশ ও সমকালীন বিশ্ব। তিউনিশিয়ায় কী হচ্ছে, কেন হচ্ছে ও কীভাবে হচ্ছে সে সম্পর্কে

জানার মাধ্যমে আমরা এখানে কী করতে চাচ্ছি, কেন তা চাচ্ছি এবং কোন পথে বা কীভাবে তা করতে চাচ্ছি, তা নির্ধারণের বিষয়ে বাস্তব শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি।

বইয়ের আলোচনার বিষয় সাজেস্টিভ নয়, ডেসক্রিপ্টিভ। এখানে ঘটনার নানা মাত্রায় বর্ণনা ও বিশ্লেষণ আছে। এত কে কীভাবে কী বুঝবেন, সেটি যার যার নিজস্ব ব্যাপার।

সমকালীন বিশ্বে ইসলাম একটা ধর্ম। এর অনুসারীদের কেউ কেউ এইটাকে একটা রাজনৈতিক ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। তা ধর্মীয়ভাবে কতটুকু সঠিক কিংবা ভুল তা নির্ণয়ের কোনো প্রয়াস এখানে নাই। বরং এটি করতে গিয়ে অর্থাৎ ইসলামী রাজনীতি করতে গিয়ে আননাহদা তথা রশিদ ঘানুশীর কৌশল বা কর্মপন্থা সম্পর্কে এখানে জানতে পারবেন। আননাহদার অগ্রজ সংগঠন ইখওয়ানুল মুসলেমীন সম্পর্কে অনেকেই কাজ করছেন। সাম্প্রতিক সময়েও কিছু বই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত। জামায়াতে ইসলামী নিয়ে আমরা দু'টি বই ইতোমধ্যে প্রকাশ করেছি।

ইসলামের দৃষ্টিতে সব সৎকাজই মূলত ইবাদাত হলেও ফিকাহ শাস্ত্রের আলোচনার সুবিধার জন্য খাস আল্লাহর হক যেসব কাজ সেগুলোকে ইবাদাত বলা হয়। আল্লাহর হকের পাশপাশি বান্দার হকও সংশ্লিষ্ট যেসব কাজে সেগুলোকে মুয়ামালাত বলা হয়। রাজনীতি হলো অন্যতম মুয়ামালাত বিশেষ। ইবাদাতের বিষয়গুলোতে নিয়ত ও পদ্ধতি সুনির্দিষ্ট ও অনমনীয়। নির্দিষ্ট তরীকার বাইরে কিছু করার সুযোগ নাই। ইবাদাতের বিষয়ে এডাপ্টেশনের কোনো সুযোগ নাই।

মুয়ামালাত তথা সামাজিক কর্মকাণ্ডে বাহ্যিক ঘোষণা, নাম ইত্যাদি ধর্মীয়ভাবে অপরিহার্য নয়। নিয়ত ও সীমা বজায় রাখা সাপেক্ষে যে কোনো ফরমেটের সৎকর্মই গ্রহণযোগ্য। রাজনীতিকে রাজনীতি হিসেবে গ্রহণ করার মানে হলো এটি যে মুয়ামালাত তা স্মরণ রাখা। এই দৃষ্টিতে, ধর্ম ও রাজনীতি এক তথা identicalও নয়; আবার বিপরীত তথা mutually exclusiveও নয় বিষয়বস্তু বোঝার জন্য এতটুকু শুধু বললাম। বাদবাকী বিষয়গুলো বই পড়লেই জানতে পারবেন। একইসাথে আমি এই বইটির সম্পাদক, সহঅনুবাদক ও প্রকাশক। সিএসসিএস-এর অপরাপর প্রকাশনার মতো এই বইটিরও সফট কপি বিনামূল্যে ডাউনলোড করতে পারবেন।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক
পরিচালক
সমাজ ও সংস্কৃতি অধ্যয়ন কেন্দ্র

১লা এপ্রিল, ২০২৩
এসই-১৫, দক্ষিণ ক্যাম্পাস
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

আমার সতেরো বছরের জেল জীবন	১০
তিউনিশিয়া: মধ্যপ্রাচ্যের জন্য দৃষ্টান্ত	১৭
রাজনৈতিক ইসলামের ব্যর্থতা দাবির সারবত্তা কতটুকু?	২৬
সেকুলারিজম, ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক	৩৩
তিউনিশিয়ার স্বপ্ন	৪৬
আন নাহদা কি ইসলামপন্থী, নাকি মুসলিম ডেমোক্র্যাট?	৫৫
আন নাহদার সাম্প্রতিক সংস্কার কার্যক্রমের সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য	৬৬
জাতীয় ঐক্য ও গণতন্ত্রের স্বার্থে ম্যান্ডেলার মতো ঘানুশীও সবকিছু করতে প্রস্তুত	৭৪
নতুন আন নাহদা কি একটি সেকুলার দল?	৮২
আন নাহদার দ্বিতীয় পর্যায়ে উত্তরণ	৯৩
তিউনিশিয়ায় ইসলামপন্থীদের মতাদর্শিক সমঝোতা	১০৯

আমার সতেরো বছরের জেল জীবন

হামাদী জেবালী

[তিউনিশিয়ায় জেসমিন বিপ্লবের পর ২০১১ সালে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন হামাদী জেবালী। তাঁকে বলা হয় তিউনিশিয়ার নেলসন ম্যান্ডেলা। দেশটিতে স্বৈরশাসনবিরোধী আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে হামাদী জেবালী ছিলেন অন্যতম। তিনি প্রেসিডেন্ট হাবিব বুরগিবার হুমকির মুখে তিউনিশিয়া থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। বুরগিবাকে ক্ষমতাচ্যুত করে প্রেসিডেন্ট হন জেইন আল আবেদীন বেন আলী। এ সময় হামাদী জেবালী দেশে ফিরে এসে একটি পত্রিকা সম্পাদনার কাজ শুরু করেন। কিন্তু সরকারবিরোধী বিভিন্ন লেখার কারণে তিনি টানা সতেরো বছর কারারুদ্ধ ছিলেন। এর মধ্যে দশ বছর তাঁকে নির্জন কারাবাসে থাকতে হয়।

জেসমিন বিপ্লবের মাধ্যমে বেন আলী ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর জেবালী ও তাঁর মধ্যপন্থী ইসলামী দল 'আন-নাহদা' জনগণের ভোটে ক্ষমতায় আসে এবং তিনি প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। কিন্তু তিনি খুব অল্প সময় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পান। তাঁর দলকে একটি স্বাধীন টেকনোক্র্যাট সরকার পরিচালনায় রাজি করাতে ব্যর্থ হয়ে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি পদত্যাগ করেন। ব্রিটিশ সংবাদ সংস্থা বিবিসি'র 'আউটলুক' অনুষ্ঠানে ম্যাথিউ ব্যানিস্টারের সাথে দোভাষীর মাধ্যমে হামাদী জেবালী তাঁর রাজনৈতিক তৎপরতা, বহু বছরের বন্দী জীবন এবং ব্যক্তিগত জীবনের নানা বিষয় নিয়ে খোলামেলা কথা বলেন। সাক্ষাৎকারটি ১৬ সেপ্টেম্বর প্রথম সম্প্রচারিত হয়। - সম্পাদক]

ম্যাথিউ ব্যানিস্টার: **রাজনীতিতে আসার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম কোন বিষয়টি আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিলো?**

হামাদী জেবালী: শুরুটা ছিলো... আসলে আমি আমার বাবার দ্বারা ব্যাপক প্রভাবিত হয়েছিলাম। যখন তিউনিশিয়া স্বাধীন হয়, তখন আমার বয়স ছিল মাত্র আট বছর। সে সময় ক্ষমতাসীন দল আরসিডি (কনস্টিটিউশনাল ডেমোক্রেটিক র‍্যালি) দুই ভাগে

ভাগ হয়ে যায়। যার একটি অংশের নেতৃত্বে ছিলেন হাবীব বরগিবা এবং অন্য অংশের নেতৃত্বে ছিলেন বিন ইউসুফ। বিন ইউসুফের বিরোধিতা থেকে নিষ্কৃতি পেতে বরগিবা সর্বোচ্চ চেষ্টা চালান। আমার বাবা ছিলেন বিন ইউসুফের অনুসারীদের মধ্যে অন্যতম। বিন ইউসুফের অনুসারীদের বিরুদ্ধে বরগিবা ব্যাপক গ্রেফতার অভিযান চালান, আমার বাবাও তাদের মধ্যে ছিলেন। এর ফলে আমরা সবাই ব্যাপক ভোগান্তির শিকার হই।

ম্যাথিউ ব্যানিস্টার: **জেলখানায় আপনার বাবাকে দেখতে যাওয়ার স্মৃতি আপনার মনে পড়ে?**

হামাদী জেবালী: সব কিছুই আমার সুস্পষ্ট মনে আছে। আমি খুবই ছোট ছিলাম। আমার বয়স ছিল প্রায় আট বছর। আমি বাবাকে দেখতে যাওয়ার জন্য প্রায়ই মাকে জ্বালাতন করতাম। এ কারণে তিনি আমাকে বাবার কাছে নিয়ে যেতেন। যখন বাবাকে দেখতে যেতাম তখন আমার ছোট ব্যাগে কিছু খাবার নিয়ে যেতাম। আমি জেলের ভিতরে যাওয়ার সুযোগ পেতাম। জেলের ভিতর অন্ধকারাচ্ছন্ন নির্জন ওয়ার্ডে আমি বাবার সাথে দেখা করতাম।

সেই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বাবার সাথে আরো একজন মানুষ থাকতেন। তিনি এবং আমার বাবা ছিলেন আমার জানা মতে স্বাধীনতা পরবর্তী তিউনিশিয়ার প্রথম রাজবন্দী। পরবর্তীতে সেই লোকটিকে বরগিবা মৃত্যুদন্ড দিলেও আলৌকিকভাবে আমার বাবা বেঁচে যান। তাঁকে মৃত্যুদন্ড দেয়ার মতো যথেষ্ট প্রমাণ তারা খুঁজে পায়নি।

বুঝতেই পারছেন, সেই সব দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা আমার স্পষ্ট মনে আছে। আর সেগুলো আমার পরবর্তী জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

ম্যাথিউ ব্যানিস্টার: **আপনি তো ফ্রান্সে ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পড়ালেখা করতে গিয়েছিলেন। আমার জানা মতে, আপনি সেখানে খুবই সক্রিয়ভাবে ছাত্ররাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন, তিউনিশিয়ার ঘটনাবলির সাথে যার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। আপনার জীবনের সেই সময় সম্পর্কে কিছু বলুন।**

হামাদী জেবালী: রাজনীতি আমার রক্তের সাথে মিশে আছে। বিশেষ করে আমার বাবা এবং আমার অতীতের প্রভাবে। তাই যখন আমি ফ্রান্সে ইঞ্জিনিয়ারিং তথা এনার্জি বিষয়ে পড়তে যাই তখন আমি ইসলামিক স্টুডেন্ট সোসাইটিতে যোগদান করি। আর এভাবে ইসলামী রাজনীতিতে সক্রিয় হই। ইউরোপ, বিশেষত ফ্রান্সে থাকাকালীন সময়ের ব্যাপক প্রভাব আমার জীবনে রয়ে গেছে। ফ্রান্সে গিয়ে ইসলামের প্রকৃত মর্ম সম্পর্কে জানার সৌভাগ্য হয় আমার। আর তা ছিল গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতার

মূলবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ পর্যায়ে আমি গভীরভাবে ইসলামকে জানার চেষ্টা করি এবং অনেক গবেষণা করি। আমি ইসলাম, স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের মধ্যে পরস্পর বিরোধী কিছুই খুঁজে পাইনি। তাই তিউনিশিয়ায় ফিরে এসে এগুলোর প্রচারণা ও প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করি।

ম্যাথিউ ব্যানিস্টার: তিউনিশিয়ায় ফিরে আসার পর আপনার রাজনৈতিক কর্মকান্ড আপনাকে সরকারের সাথে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে ফেলে। আমার জানা মতে, প্রেসিডেন্ট বরগিবা আপনাকে জীবননাশের হুমকি পর্যন্ত দিয়েছিলেন।

হামাদী জেবালী: বুরগিবা যখন সালেহ বিন ইউসুফকে মৃত্যুদন্ড দেয়, তখন আমরা ভেবেছিলাম, বরগিবা তিউনিশিয়ায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন। কিন্তু তিনি একনায়কে পরিণত হন এবং একদলীয় শাসন কায়েম করেন। তিনি বামপন্থী, ইসলামপন্থী কিংবা অন্য কোনো দলের অনুসারী কাউকে রাজনীতি করার সুযোগ দেননি। উপরন্তু তিনি আমাদের জেলে পাঠালেন। যার ফলে আমরা ব্যাপক ভোগান্তির শিকার হই।

ম্যাথিউ ব্যানিস্টার: **আপনি বললেন, অনেক ভোগান্তির শিকার হয়েছেন কিংবা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। সে সময় আপনি কি ধরনের বঞ্চনার শিকার হয়েছিলেন?**

হামাদী জেবালী: বেন আলী ১৯৮৭ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বুরগিবাকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজে প্রেসিডেন্ট হন। এর তিন বছর পর, ১৯৯০ সালে বেন আলীর সময় আমি কারাবন্দী হই। আমাকে ষোল বছরের সাজা দিয়ে কারাগারে পাঠানো হয় এবং 'আল-ফজর' পত্রিকা প্রকাশের দায়ে আরো এক বছরের সাজা দেওয়া হয়। এভাবে মোট সতের বছর জেলখানায় বন্দী থাকতে হয়।

বুরগিবা এবং বেন আলীর শাসনামলে জেলখানায় বন্দী জীবনের মধ্যে ছিল ব্যাপক পার্থক্য। বরগিবার সময় আমরা ছিলাম রাজনৈতিক বন্দী কিংবা বিশেষ বন্দী এবং আমাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা হত। আমরা বেশ কিছু স্বাধীনতা ভোগ করতাম। বলতে গেলে আমাদের উপর কোনো রকম নির্যাতন কিংবা খারাপ ব্যবহার করা হয়নি।

কিন্তু বেন আলীর সময়টা ছিল ভয়াবহ নির্যাতন, নিতান্তই অসম্মানজনক এবং মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। আমার সতের বছরের জেল জীবনে দীর্ঘ দশ বছর নির্জন কারাবাসে ছিলাম। বেন আলী প্রায়ই আমাদেরকে আমাদের বাড়ি থেকে বহুদূরে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পাঠিয়ে দিতেন। এর ফলে আমাদেরকে দেখতে আসার জন্য আমাদের পরিবারের লোকজনকে শত শত কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে

হত। কিন্তু এত কষ্ট করে আসার পর তাঁরা মাত্র ৪/৫ মিনিট কিংবা সর্বোচ্চ ১০ মিনিট আমাদের সাথে দেখা করার জন্য সময় পেত। আমাদের সাথে কোনো প্রকারের বই রাখা কিংবা নামাজ পড়ার অনুমতি ছিল না। এমনকি পবিত্র কোরআন রাখা পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল। অবস্থা এমন ছিল যে, বেন আলীর জেলখানায় যাওয়া মানেই ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হওয়া।

ম্যাথিউ ব্যানিস্টার: **আপনি নির্যাতন শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আপনি যখন কারাগারে ছিলেন তখন কি শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন?**

হামাদী জেবালী: না, আমি শারীরিক নির্যাতনের শিকার হইনি। আমাকে কখনোই শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয়নি। আমাদের কর্মী এবং অন্যান্যদেরকে খুবই জঘন্যভাবে নির্যাতন করা হত। তবে আমি সব সময়ই মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছি। বিশেষ করে, তিন মিটার দীর্ঘ এবং দুই মিটার প্রস্থের সেই ছোট্ট কক্ষে নির্জন কারাবাসের সময় আমি ভয়াবহ মানসিক নির্যাতনের শিকার হই। আমি সারাদিনে মাত্র পনের মিনিটের জন্য সেলের বাইরে যেতে পারতাম। এই সময়টুকু ছিল আমার জন্য বিরতি। যখন আমাকে এ বিরতি দেওয়া হত, তখনও আমাকে নির্জন রাখা হত। আমি কারো সাথে মিশতে পারতাম না। কেউই আমার সাথে কথা বলতে পারত না, আমাকেও কারো সাথে কথা বলতে দিত না। তাই আমি মনে করি, শারীরিক নির্যাতনের চেয়ে মানসিক নির্যাতন অত্যন্ত ভয়াবহ।

ম্যাথিউ ব্যানিস্টার: **আপনাকে আপনার কমবয়সী মেয়েদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছিল, যা অবশ্যই একটি দুঃসহ ব্যাপার। আমার জানা মতে, আপনি তাদের জন্য সাবান এবং খেজুরের বিচি দিয়ে উপহার বানাতেন। সে সম্পর্কে কিছু বলুন।**

হামাদী জেবালী: ওই সময়টা আমার জন্য ছিল সবচেয়ে দুঃসহ। আমার মেয়ে তিনটি ছিল বয়সে অনেক ছোট। তাদের মায়ের কোনো উপার্জন ছিল না। এ অবস্থায় আমি আমার তিনটি মেয়েকে তাদের মায়ের কাছে দেখাশোনা এবং বড় করার জন্য রেখে এসেছিলাম। পুলিশ বাড়িতে এসে প্রায়ই তল্লাশি চালাতো। আমার বন্ধুরা কিংবা পরিবারের লোকেরা কেউ তাদেরকে স্বাধীনভাবে দেখতে যেতে পারত না। আর কঠোর নজরদারী থাকায় কেউ আমার স্ত্রীকে কোনো ধরনের আর্থিক সাহায্যও করতে পারত না।

আমি অবশ্যই আমার স্ত্রীর প্রতি চির কৃতজ্ঞ। আমি যখন জেলে ছিলাম সে আমাকে মানসিকভাবে উৎসাহ দিয়েছে। সে পুলিশি এবং মানসিক নির্যাতনের পরেও ধৈর্য ধরে ছিল। সে মেয়েদেরকে খুব সযত্নে লালন-পালন করেছে। তারা স্কুলে অনেক ভাল করেছে এবং স্নাতক ডিগ্রিসহ শিক্ষা জীবন শেষ করেছে। কিন্তু সেটা আমার

জন্য একটি চ্যালেঞ্জিং বিষয় ছিল। আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার স্ত্রীকে বুঝাতে চেষ্টা করতাম যে, আমি তাদের বিষয়ে অনেক বেশি আগ্রহী এবং আমি তার এই ত্যাগকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করি।

আমি জেলে আছি, তাই আমি তাদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন- এই চিন্তা না করে আমিও আমার মেয়েদের লালন-পালনে যতটুকু সম্ভব নিজেকে সম্পৃক্ত রাখার চেষ্টা করতাম। এজন্য আমার হাতের নাগালে যাই পেতাম, তা দিয়ে কিছু একটা করার চেষ্টা করতাম। অন্যান্য বন্দীদের মত আমাকেও প্রতি সপ্তাহে একটা সাবান দেয়া হত। আমি প্রায়ই সাবান খোদাই করে বিভিন্ন খেলনা বানাতাম এবং খেজুরের বিচি খোদাই করে কিছু একটা বানাতাম এবং যখন তারা আমাকে দেখতে আসত, আমি তাদেরকে সেগুলো উপহার দিতাম। এমনকি এভাবে আমি পুরো দাবার গুটির সেট বানিয়ে আমার মেয়েদেরকে দিয়েছিলাম, যা দিয়ে তারা খেলত। যা হোক, আমি আমার স্ত্রীর প্রতি অনেক বেশি কৃতজ্ঞ তার এই অসামান্য ত্যাগের জন্য। আমি আমার মেয়েদেরকে অনেক বেশি ভালবাসি। তারা স্কুলে লেখাপড়ায় অনেক ভাল করেছে। তারা এখন উচ্চ শিক্ষিত।

ম্যাথিউ ব্যানিস্টার: **২০০৬ সালে জেল থেকে মুক্তির পর আপনার জন্য পরিবারের সাথে পূনর্মিলিত হওয়া নিশ্চয়ই কঠিন কাজ ছিল। বিষয়টি অনেক আনন্দের আবার অনেক কষ্টেরও। কারণ আপনি আপনার মেয়েদের শৈশব থেকে বঞ্চিত হয়েছেন এবং তারাও। তাদেরকে আবার ফিরে পেয়েছেন...**

হামাদী জেবালী: না, বিষয়টি তেমন কঠিন ছিল না। কারণ জেলে থাকার সময় আমার চারপাশ এবং এ দেশে কি ঘটছে- সবকিছু বুঝার চেষ্টা করতাম। যখন আমি জেল থেকে মুক্তি পেলাম তারপরও তাদের নজরদারী অব্যাহত ছিল। এ ব্যাপারটি আমাকে সাঙ্ঘাতিকভাবে আহত করেছিল। বলতে গেলে আমার কোনো স্বাধীনতাই ছিল না। তখনও আমার পরিবার এবং বন্ধুদেরকে বিভিন্নভাবে ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছিল। সে সময় আমি জেলে ফেরত যাওয়ার কথা ভাবতাম। কারণ আমি আমার পরিবারের উপর এই ধরনের ভীতি প্রদর্শন এবং নির্যাতন মেনে নিতে পারছিলাম না।

ম্যাথিউ ব্যানিস্টার: **জেসমিন বিপ্লব শুরু হয়েছিল যখন মোহাম্মাদ বোজিজি নামে একজন দোকানদার নিজের গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। আপনি কি সে সময় বুঝতে পেরেছিলেন যে, এটি সেই মুহূর্ত, যা পুরো তিউনিশিয়া জুড়ে পরিবর্তনের সূচনা করতে যাচ্ছে?**

হামাদী জেবালী: তিউনিশিয়ার বিপ্লব বোজিজির আত্মদানের মাধ্যমে শুরু হয়নি। অনেক বছর আগেই শুরু হয়েছে। একনায়ক বেন আলী ক্ষমতায় আসার পর

অর্থনৈতিক মন্দাসহ তিউনিশিয়ার জনজীবনে ব্যাপক দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের বহু কর্মীকে জীবন দিতে হয়। অনেকে ভয়াবহ নির্যাতন, জেল-জুলুমের শিকার হয়। তিউনিশিয়ার বিপ্লব বোজিজির আত্মদানের মাধ্যমে চরম পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। বলতে গেলে তিনি ছিলেন অগ্নিস্ফূলিঙ্গ, যার মাধ্যমে সব অন্যায় আগুনে পুড়ে ছাড়খার হয়ে যায়। আমি প্রত্যেককে অভিবাদন জানাই, যারা তিউনিশিয়ার বিপ্লবে অংশ নিয়েছেন এবং যাদের মাধ্যমে 'জেসমিন বিপ্লব' চরম পরিণতি পায়।

ম্যাথিউ ব্যানিস্টার: **আপনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর বলেছিলেন, আপনার সরকার হবে তিউনিশিয়ার সকল মানুষের জন্য। কিন্তু আপনার সমালোচকদের অভিযোগ, উগ্রবাদী ইসলামপন্থীদের প্রতি আপনার বিশেষ দুর্বলতা ছিল। এই সমালোচনাটি কতটুকু যৌক্তিক বলে আপনার মনে হয়?**

হামাদী জেবালী: না, অবশ্যই সেটির কোনো যৌক্তিকতা নেই। আমি কখনোই চরমপন্থীদের প্রতি দুর্বল ছিলাম না। আমার মত যারা স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে চায়; তারা কারো প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করতে পারেন না। তাই আমি তিউনিশিয়ার জনগণের উদ্দেশ্যে বলেছিলাম, তারা হতে পারেন বামপন্থী কিংবা ডানপন্থী, সবার স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হবে। কোনো অস্ত্রের ব্যবহার নয়, কারণ অস্ত্র হাতে নিয়ে সংলাপে বসা সম্ভব নয়। সুতরাং আমি কারো প্রতি বেশি দুর্বল ছিলাম না। আমি সেটা স্পষ্ট করে দেখিয়েছি। যখনই কেউ চরমপন্থার আশ্রয় নিয়েছে, তখনই তাকে বিচারের সম্মুখীন করা হয়েছে।

ম্যাথিউ ব্যানিস্টার: **ঠিক আছে। কিন্তু বিরোধী দলীয় নেতার হত্যাকান্ডের মত এত বড় একটি ঘটনা যা আপনার সরকারের জন্য সংকটের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।**

হামাদী জেবালী: না, এটা সে ধরনের সংকটময় মুহূর্ত ছিল না। এই ঘটনা আমার পদত্যাগকে ত্বরান্বিত করেনি। চোকরি বেলায়েতের হত্যাকান্ডের কারণে আমি পদত্যাগ করিনি। কারণ আমি পদত্যাগের বিষয়ে আগে থেকেই ভেবেছিলাম। একজন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমার যে সব কাজ করা উচিত ছিল, আমি সেগুলো করতে পারছিলাম না। আর সেজন্যই আমি পদত্যাগ করেছি।

আমি কখনোই চাইনি অন্তর্বর্তীকালীন সময় বেশি দীর্ঘায়িত হোক। আমার মনে হয়েছিল, এটা খুব বেশি দীর্ঘায়িত হতে চলেছে। আমি চেয়েছিলাম মানুষ স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাক। তাই আমি তিউনিশিয়ার জনগণের স্বার্থে পদত্যাগ করেছি, যেন তারা একটি টেকনোক্র্যাট সরকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে, যারা আরো স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবেন। আর এ কারণেই আমি পদত্যাগ করেছি।

ম্যাথিউ ব্যানিস্টার: **আপনি বহু বছর ধরে তিউনিশিয়ার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন, বহু বছর জেলে থেকেছেন কিন্তু এখন আপনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যেতে পারলেন না, আপনাকে পদত্যাগ করতে হল। এটি অবশ্যই তিক্ত অভিজ্ঞতা এবং পরস্পর বিরোধী ঘটনা। যেদিন আপনি পদত্যাগ করেছিলেন, সে দিনটি নিশ্চয়ই আপনার জন্য অনেক দুঃখজনক ছিল?**

হামাদী জেবালী: না, আমি এ রকম সামান্য একটি কারণে মোটেও কষ্ট পাইনি। আমি তিউনিশিয়া শাসন করব কিংবা প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, এমনকি একজন মন্ত্রী হব- এমন স্বপ্ন কখনোই আমার ছিল না।

আমি একজন বড় ব্যবসায়ী হতে পারতাম। এনার্জি বিষয়ক বিশেষজ্ঞ বা ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আমার অনেক বড় বড় প্রকল্প থাকতে পারত। কিন্তু আমি গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতার জন্য আমার জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছি। যখন আমি বুঝতে পারলাম আমি আমার লক্ষ্যে কাজ করতে পারছি না, তখন আমি পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।

ম্যাথিউ ব্যানিস্টার: **আরব বসন্ত এবং তার পরবর্তী ঘটনা প্রবাহের মাধ্যমে একটা বিষন্নতা এবং মানুষের মাঝে একটা ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, যারা ক্ষমতায় এসেছেন, তারা তাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করছে না। এই অবস্থায় আপনি কি তিউনিশিয়ার ভবিষ্যত নিয়ে আশাবাদী কি না? আপনি পদত্যাগ করেছেন, এর মানে কি আপনি আশাহত?**

হামাদী জেবালী: অবশ্যই আমি আশাবাদী, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমি তিউনিশিয়ার ব্যাপারে খুবই আশাবাদী। আমি তিউনিশিয়ায় গণতন্ত্র এবং প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অত্যন্ত আশাবাদী। ইসলামের সর্বপ্রথম মূল্যবোধ হলো স্বাধীনতা। তাই আমার মনে হয় আরব বসন্ত তিউনিশিয়ার জনগণ, আরব এবং গোটা বিশ্বে মুসলমানদের জন্য স্বাধীনতা নিয়ে এসেছে। আমি মনে করি, একনায়কতন্ত্র এবং অবিচারের যাঁতাকলে এগুলোর কোনোটিই সম্ভব ছিল না। সুতরাং আমি তিউনিশিয়ার ভবিষ্যত নিয়ে অনেক বেশি আশাবাদী।

অনুবাদ: মো. হাবিবুর রহমান হাবীব

তিউনিশিয়া: মধ্যপ্রাচ্যের জন্য দৃষ্টান্ত

ইবরাহীম শারকীহ

[১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে ফরেন অ্যাফেয়ার্সে **Tunisia's Lessons for the Middle East: Why the First Arab Spring Transition Worked Best** শিরোনামে ইবরাহীম শারকীহ এই নিবন্ধটি লিখেন। - সম্পাদক]

আরব বিশ্বের সবচেয়ে জোরালো নিরাপত্তাবেস্টিত রাষ্ট্র তিউনিশিয়া। ২০১১ সালে এর প্রেসিডেন্ট জেইন এল-আবেদিন বেন আলীর আকস্মিক পতন ঘটে। এর প্রতিক্রিয়ায় এবং অব্যবহিত পরবর্তীতে মিশর থেকে ইয়েমেন পর্যন্ত একের পর এক স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের বিস্ফোরণ ঘটে। কিছু কিছু দেশে আন্দোলন ব্যর্থ হলেও কয়েকটি দেশে স্বৈরাচারী শাসকদের অপসারণ করা সম্ভব হয়েছে।

যদিও তিউনিশিয়ার অভ্যন্তরে অনেক সমস্যা রয়েছে; তারপরও বলা যায়, আরব বসন্তের ছোঁয়া লেগেছে এমন দেশগুলোর সাথে তুলনা করলে দেশটি বেশ ভালো অবস্থায় রয়েছে। তিউনিশিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ের জ্যেষ্ঠ সরকারী কর্মকর্তা, শীর্ষ রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সুশীল সমাজের শীর্ষ প্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ, বিশ্লেষক এবং এককালীন রাজবন্দীদের সাক্ষাৎকারে এটা স্পষ্ট যে, রাষ্ট্র হিসাবে তিউনিশিয়া সুষ্ঠু উত্তরণ প্রক্রিয়া এবং যৌক্তিক নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অপরাপর আরব রাষ্ট্রগুলো যেহেতু নতুন সরকার ব্যবস্থা গঠনের সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে, তাই তিউনিশিয়া থেকে তাদের অনেক কিছু শেখার আছে।

সাম্প্রতিক কালে তিউনিশিয়া বেশ জটিল রাজনৈতিক সংকট মোকাবেলা করে যাচ্ছে। গত ২৫ জুলাই একজন সালাফী চরমপন্থী জাতীয় গণপরিষদের প্রথিতযশা সদস্য (সাময়িক) মোহাম্মদ আল ব্রাহিমীকে হত্যা করে। এর প্রতিক্রিয়ায় ৫০ জনেরও বেশি বিরোধী দলীয় সদস্য গণপরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন। তাঁরা সরকার ভেঙ্গে দিয়ে একটি নতুন টেকনোক্র্যাটিক সরকার গঠনের দাবি জানান, যেন বাদ-বাকি সময়ে নতুন নেতৃত্বের মাধ্যমে জাতীয় রূপান্তর প্রক্রিয়া সহজতর হয়। লক্ষণীয়,

নিজেদের শীর্ষনেতার হত্যাকাণ্ডের পর অস্ত্রধারণ করার পরিবর্তে বিরোধী দলগুলো শান্তিপূর্ণভাবে এ ঘটনার প্রতিবাদে আন্দোলন করেছে।

যাহোক, চলমান অচলাবস্থা দূর করতে সরকার সকল পক্ষের সাথে নিবিড়ভাবে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। শুরু থেকেই তাঁরা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ছাড় দেওয়ার প্রস্তাব দিয়ে আসছে। যেমন, জাতীয় ঐক্যমতের সরকার গঠন এবং গণপরিষদের অধিবেশন স্থগিত করা, যা ছিল বিরোধীদলের অন্যতম দাবি। সেখানে মিশরের মত বিদেশীদের মধ্যস্থতা বা হস্তক্ষেপের কোনো প্রসংগ আসেনি। যদিও টেকনোক্র্যাটিক সরকার গঠনের বিষয়ে এখনো তাঁরা কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি। তারপরও সকল পক্ষ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং বিকল্প সমাধানে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। শুরু থেকেই তিউনিশিয়ার নেতৃবৃন্দ জাতীয় রূপান্তর প্রক্রিয়া নিয়ে যৌথভাবে কাজ করছেন, এটা তারই প্রমাণ।

মিশরে মূলধারার ইসলামপন্থীরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও ক্ষমতা ধরে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। আমরা জানি, মোবারক পরবর্তী ভোটে মুসলিম ব্রাদারহুড শক্তিশালী অবস্থান প্রদর্শন করেছে। ঠিক তাদের মত তিউনিশিয়ায় 'আন-নাহদা' পার্টি বেন আলী পরবর্তী ভোটে গণপরিষদে ৪১ শতাংশ আসনে জয়লাভ করে। অন্যান্য দলগুলোর মতো শক্তিশালী অবস্থান তৈরির পরিবর্তে আন-নাহদার নেতৃবৃন্দ 'আত-তাকাতুল' এবং 'কংগ্রেস ফর দ্যা রিপাবলিক পার্টি'র (দুটি দলই রক্ষণশীল বাম) সাথে ত্রিপক্ষীয় জোট গঠন করে। এছাড়াও ক্ষমতাসীন আন-নাহদা দেশের প্রেসিডেন্ট পদে দৃশ্যত সেকুলার মোনসেফ মারজুকির মনোনয়নকে সমর্থন দেয়ার মতো দূরদর্শী সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিল।

কংগ্রেস ফর দ্যা রিপাবলিক পার্টির প্রধান মারজুকি একজন মানবাধিকার কর্মী। তিনি বেন আলীর সময় জেল খেটেছিলেন। তার দল গণপরিষদে মাত্র ১৩.৪ শতাংশ আসন পেয়েছে। দল তিনটির মতাদর্শগত পার্থক্য সত্ত্বেও প্রায় দুই বছর ধরে তাঁদের জোট টিকে আছে। মারজুকি এখন পর্যন্ত জোটের মধ্যে তাঁর শীর্ষ অবস্থান ধরে রেখেছেন। তবে চলমান রাজনৈতিক সংকট মোকাবেলা এবং সর্বোপরি একজন শক্তিশালী জাতীয় নেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করায় তিনি ব্যর্থ হয়েছেন ।

অধিকাংশের জন্য ন্যায়বিচার

তিউনিশিয়ার অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সর্বজনগ্রাহ্য ও যৌক্তিক ন্যায়বিচার ভিত্তিক আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছে, যা প্রশংসার দাবি রাখে। আইনের খসড়া তৈরির জন্য গঠিত স্বাধীন কমিটিতে ১২ সদস্যের মধ্যে মাত্র দুইজন

আইন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা; বাকি দশজনকে সুশীল সমাজ থেকে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ঐ প্রতিনিধিদল সারা দেশে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁদের মতামত গ্রহণ করেছে। তাঁরা জানার চেষ্টা করে, বেন আলীর শাসনামলে ক্ষতিগ্রস্তরা বর্তমানে ন্যায়বিচার প্রক্রিয়ায় কোন ধরনের বিষয়গুলোর প্রয়োজনীয়তাবোধ করেন এবং তাঁদের প্রত্যাশাগুলো কি। এই কমিটি রূপান্তর-প্রক্রিয়া এবং ন্যায়বিচার আইন বিষয়ক কমিটিতে সুশীল সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের সাথে পরামর্শ করেছে। 'দি আল-কাওয়াকিবি ডেমোক্র্যাসি ট্র্যানজিশন সেন্টার' এবং 'দি তিউনিশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ট্র্যানজিশনাল জাস্টিস' উভয়ই এই কমিটিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে।

তিউনিশিয়া পূর্বের শাসন ব্যবস্থা সংস্কারের বিষয়ে মধ্যমপন্থা বেছে নিয়েছে। আইন তৈরির ক্ষেত্রে লিবিয়া 'রাজনৈতিক বিচ্ছিন্ন আইনের' (Political Isolation Law) মাধ্যমে ১৯৬৯ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত কর্মরত সরকারী কর্মকর্তাদেরকে বিচারের মুখোমুখি করেছে। লক্ষ্য করবার বিষয়, এ ধরনের প্রতিশোধমূলক বিষয়গুলোকে তিউনিশিয়া সচেতনভাবে এড়িয়ে গেছে। তিউনিশিয়া ইয়েমেনের চেয়েও প্রাগ্রসর কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য, 'উপসাগরীয় দালালী নিষ্পত্তি আইনে'র সাথে 'সুরক্ষা আইন' (immunity law) সংযোজন করে ইয়েমেন অন্তর্বর্তীকালীন ন্যায়বিচার প্রতিরোধের যে কোনো প্রয়াস নস্যাৎ করার ব্যবস্থা করেছে। ইয়েমেনে অতীত অপরাধের দায়ে কাউকে দায়ী করা হয়নি এবং আগের ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে কোনো সংস্কার আরোপ করা ছাড়াই শাসনকার্য অব্যাহত রেখেছে।

তিউনিশিয়ার দৃষ্টিভঙ্গিকে বলা হচ্ছে 'তাহসিন আত-তাওরা' (বিপ্লবের সুরক্ষা)। সেখানে কিছু সাবেক সিনিয়র কর্মকর্তাকে পাঁচ বছর সরকারী অফিস থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যাদেরকে বিচারের মুখোমুখি কিংবা দোষী সাব্যস্ত করা হয়নি, তাদেরকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়েছে। এর অংশ হিসেবে হাবিব বুরগিবার আমলে সরকারী কর্মকর্তা বেজি সাঈদ এসেবসিকে 'নিদা তিউনেস' পার্টির নেতৃত্বে থাকার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এসেবসি ইতোমধ্যে বলেছেন, তিনি পরবর্তী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশগ্রহণের পরিকল্পনা করছেন। তিউনিশিয়া পরিবর্তনকালীন ন্যায়বিচারের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেছে। এর অংশ হিসেবে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিকেন্দ্রিক মামলা দায়ের করে বিচারের সম্মুখীন করা হচ্ছে। বিচার সম্ভব না হলে তাদেরকে ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে জনজীবন থেকে সরিয়ে দেয়া সম্ভব বলে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার মনে করে।

লিবিয়ার মতো করে সর্বাত্মক প্রতিস্থাপন (full-scale purge or *tatheer*) এর পরিবর্তে সংবিধান-পরিষদ ক্রমধারায় পরিবর্তন (the approach of shifting or

gharbala) এর নীতিকে গ্রহণ করেছে। বিচার বিভাগ সংস্কারের ক্ষেত্রে যে সব বিচারকের বিরুদ্ধে দুর্নীতি বা অসদাচারণের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে শুধুমাত্র তাদের অপসারণের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করা হয়েছে।

নিরাপত্তা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে তাঁরা নতুন কার্যকর কাঠামো গঠন করেছে। যেমন, নির্যাতন প্রতিরোধে শুধুমাত্র জাতীয় কর্তৃপক্ষ নজরদারী (supervise) করবে। তাঁরা দেশের কারাগারগুলো পর্যবেক্ষণ ও পরিবদর্শন করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত। তাঁরা যে কোনো কারাগারে প্রবেশ করে বন্দীদের সাক্ষাৎকার নিতে পারবে। সরকারের বিরুদ্ধে মিডিয়া নিয়ন্ত্রণের অভিযোগ থাকলেও বাস্তবে গণপরিষদ রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া পরিদর্শন ও সংস্কারের জন্য বিশেষ কমিটি গঠন করেছে। ঐ মিডিয়াগুলো এতদিন সাবেক একনায়কতন্ত্র ও ঐতিহাসিকভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থার গৌরবগাঁথা প্রচার করত। এসব প্রচেষ্টার পাশাপাশি পুরোনো শাসনব্যবস্থার উত্তরাধিকার নির্বাচন করার জন্য জাতীয় সংলাপের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুরো প্রক্রিয়াটি রাষ্ট্রপতি এবং 'তিউনিশিয়ান জেনারেল লেবার ইউনিয়নের' (UGTT) অধীনে এগিয়ে নেয়া হচ্ছে।

রাষ্ট্রের প্রকৃতি, নির্বাচন এবং সংবিধানের মৌলিক উপাদান ইত্যাদিসহ দেশটি যে সকল প্রধান চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন সেসব বিষয়ে ঐক্যমতে পৌঁছানোর লক্ষ্যে এই সংলাপের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ষাটটিরও বেশি রাজনৈতিক দল এবং পঞ্চাশটি সুশীল সমাজের সংগঠন সমান্তরালে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে তাঁরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ঐক্যমতে পৌঁছেছে। যেমন, সর্বাবস্থায় যথাসম্ভব সহিংসতা পরিহার করা, অর্থনৈতিক খাতে সরকারের অগ্রাধিকার প্রদান ও সকলের সহযোগিতা, রূপান্তরের লক্ষ্যে একটি রোডম্যাপ তৈরি, একটি বেসামরিক রাষ্ট্র ও সংবিধান ব্যবস্থার মতো বিষয়ে ঐক্যমত্য, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং সমাবেশের স্বাধীনতা ইত্যাদি। এছাড়াও ১৭টি রাজনৈতিক দল ও সুশীল সমাজের চারটি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে জাতীয় সংলাপ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

তিউনিশিয়ায় রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির উৎস

তিউনিশিয়ার চলমান পুরো রূপান্তর প্রক্রিয়ায় অনেকগুলো সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংস্থা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে। বিভিন্ন সংলাপে তিউনিশিয়ার জনগণ বার বার জোর দিয়ে বলার চেষ্টা করেছে যে, তাঁরা কট্টরপন্থা ও সহিংসতাকে সমর্থন করে না। আন-নাহদার রাজনীতিবিদ সাইয়্যেদ ফেরজানিসহ অনেকেই মনে করেন যে, মধ্যপন্থী মালিকি মাজহাবের প্রসারের ফলে ঐতিহাসিকভাবে তাঁরা চরমপন্থাকে পরিহার করেছেন। উল্লেখ্য, তিউনিশিয়ার ৯৮ শতাংশ মানুষ ঐতিহ্যগতভাবে মালিকি

মাজহাবের অনুসারী। এ ধরনের মধ্যপন্থী জাতীয়-মানস গঠনের পিছনে কেউ কেউ তিউনিশিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট বরগিবার শাসনামল (১৯৫৭-১৯৮৭) এবং তাঁর আধুনিকায়ন প্রকল্পের সাংস্কৃতিক প্রভাবের কথা বলেন। এছাড়া তিউনিশিয়ায় তেমন কোনো জাতিগত, উপজাতীয় কিংবা বিচ্ছিন্নতাবাদী ধর্মীয় বিভেদ নেই বললেই চলে, যা অন্যান্য দেশে অনেক প্রকটভাবে দেখা যায়।

শুধুমাত্র ঐতিহ্য ও অবকাঠামোগত বিষয়গুলোর মাধ্যমে তিউনিশিয়ার অবস্থা পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা দুরূহ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আন-নাহদা পার্টির দৃষ্টিভঙ্গী, যা মিশরের মুসলিম ব্রাদারহুড থেকে অনেকখানি ভিন্নতর। মিশরে ব্রাদারহুডের নেতারা দশকের পর দশক ধরে দমন, নির্যাতন এবং বাধ্যতামূলক সংস্কারের শিকার হয়েছে। তাঁদের রাজনৈতিক কর্মসূচি স্বৈরশাসকের কারাগারেই ঘুরপাক খায়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, মুসলিম ব্রাদারহুডের সর্বোচ্চ নেতা মোহাম্মদ বাদী প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুল নাসের এবং আনোয়ার সাদাতের শাসনামলে ১৯৬৫ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত জেল খেটেছেন। অতিসম্প্রতি তাঁকে আবারো কারারুদ্ধ করা হয়েছে। আন-নাহদার নেতৃবৃন্দও বেন আলীর সময় বছরের পর বছর নির্বাসিত জীবন যাপন করেছেন। ১৯৯১ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত আন-নাহদার নেতা রশিদ আল-ঘানুশী লন্ডনে নির্বাসিত ছিলেন। দলটির অন্যান্য শীর্ষনেতাদের অবস্থাও একই। এইসব অভিজ্ঞতার ফলে আন-নাহদার রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার উপর এক ধরনের আধুনিকায়নের প্রভাব পড়ে। ফলে তাঁরা সমন্বয়মূলক আদর্শ ধারণ ও লালন করার সুযোগ পায়। উল্লেখ্য যে, মিশরে সালাফীরা ২০১১ সালের নির্বাচনে ২৮ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। তাঁদের তুলনামূলক প্রভাবের ফলে দেশটির রাজনীতিতে এক ধরনের মেরুকরণ তৈরি হয় এবং এটি মিশরের ব্রাদারহুডকে অধিকতর দক্ষিণপন্থার দিকে ঠেলে দেয়।

মিশরের বিপরীতে তিউনিশিয়ায় একটি পেশাদার ও প্রজাতন্ত্রের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং রাষ্ট্রের কাজে কোনো হস্তক্ষেপ করে না- এমন সেনাবাহিনী আছে। মিশরের সেনাবাহিনী ঐতিহাসিকভাবে জনগণের সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছে। এমনকি তাদের নিজস্ব আন্তর্জাতিক মিত্র রয়েছে। যার ফলে যুক্তরাষ্ট্র ও মিশরীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক মাঝে মাঝে দ্বিপাক্ষিক কূটনৈতিক সম্পর্ককে ছাপিয়ে যায়। অন্যদিকে, তিউনিশিয়ার সেনাবাহিনী বেন আলীর ক্রীড়নক ছিল না এবং পরবর্তী রূপান্তর প্রক্রিয়ায়ও তা দেখা যাচ্ছে। কারণ তারা দৃশ্যত তিউনিশিয়ার রাজনীতিতে অনুপস্থিত।

এছাড়াও পুরো রূপান্তর প্রক্রিয়ায় একটি কার্যকর সংবিধান-পরিষদ থাকার ফলে তিউনিশিয়া অনেক বেশি সুবিধা পেয়েছে, যা কিনা বিভিন্ন বিষয়ে ঐক্যমতে পৌঁছার

জন্য একটি বৈধ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করেছে। অন্যদিকে, মিশরে সংসদের একটি দুর্বল উচ্চ কক্ষের কাছে ক্ষমতা দিয়ে আদালতের আদেশে নিম্ন কক্ষের কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। সম্প্রতি তিউনিশিয়ার সংবিধান-পরিষদের কার্যক্রম স্থগিত করা হলেও আশা করা যায় শীঘ্রই তাদের কার্যক্রম শুরু হবে। দেশটির রাজনৈতিক সংকটে মধ্যস্থতার বেশিরভাগ প্রচেষ্টায় মনে হয় তাঁরা একটি রেজুলেশন তৈরির কাছাকাছি পৌঁছেছে; যার ফলে পরিষদের কাজ পুনরায় শুরু করার উপর বেশ তাগিদ দেয়া হচ্ছে। এছাড়াও, জাতীয় সংলাপ এবং মধ্যস্থতার জন্য সুশীল সমাজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

তিউনিশিয়া মডেল

এটা বলা কখনোই ঠিক হবে না যে, তিউনিশিয়ার রূপান্তর প্রক্রিয়া কোনো চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়নি। দেশটিতে চলমান বিভিন্ন প্রতিবাদ সমাবেশ এবং অর্থনীতির বেহাল দশার মাধ্যমে বিষয়টি বেশ পরিষ্কার বুঝা যায়। রূপান্তরের জন্য বড় ধরনের বাজেটের প্রয়োজন। দেশটির পুনর্গঠন মূলত পূর্বের শাসনামলে বিভিন্ন সময় কারাবন্দী, যারা গুম হয়েছিল তাদের পরিবার এবং বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ক্ষতিপূরণের উপর অনেকাংশে নির্ভর করছে। তিউনিশিয়ায় দারিদ্রের হার বেড়েই চলছে এবং দেশটির পর্যটন শিল্প, বিপ্লব এবং বিপ্লব পরবর্তী ঘটনা প্রবাহের ফলে মারাত্মকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। পর্যটকেরা পর্যটন এলাকাগুলোতে খুব কমই যায় এবং গেলেও এলাকাগুলো প্রায় জনশূন্য, যা স্বাভাবিক দৃশ্যে পরিণত হয়েছে।

এছাড়াও তিউনিশিয়ার বিপ্লব সুরক্ষা কমিটিসমূহ (CPRs- The Committees for the Protection of the Revolution) রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ এবং আইনের শাসনের বিষয়ে এক কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। সাবেক বিপ্লবীদের নিয়ে গঠিত এই কমিটিগুলো বিপ্লব রক্ষার দায়ভার নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছে এবং পুরোনো শাসন উপাদানগুলোকে জবাবদিহিতার আওতায় আনার বিষয়ে আগ্রহী। যদিও রূপান্তর প্রক্রিয়া অনেকখানি এগিয়েছে, কমিটির সদস্যরা বিপ্লবের ফলে ক্ষমতাচ্যুতদের দ্বারা একটি প্রতিবিপ্লবের আশংকা করছন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বিরোধী দলের রাজনীতিবিদ 'নিদা তিউনিশ পার্টি'র লুতফি নাবিককে হত্যার অভিযোগ রয়েছে একটি কমিটির বিরুদ্ধে।

তিউনিশিয়ায় UGTT-কে আক্রমণ করার অভিযোগও রয়েছে CPRs এর বিরুদ্ধে। কয়েকটি বিরোধী দল দাবি করে যে, CPRs হল আন-নাহদা পার্টির রক্ষীবাহিনী। বাস্তবতা হল, যদিও সেখানে কিছু দলীয় লোক আছে কিন্তু তারা সে রকম নয়। বরং অন্যান্য যে কোনো বিপ্লবে যেমন বিপ্লবকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করা হয়,

তিউনিশিয়ার বিপ্লবও তার ব্যতিক্রম নয়। সেখানে এই কমিটিগুলোকে মোকাবেলার বিষয়টি অন্যতম কারণ। আন-নাহদার যুক্তি হল, কোনো রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কমিটিগুলোকে যদি ভেঙে দেয়া হয়, তাহলে পুরো রূপান্তর প্রক্রিয়ায় ধ্বস নামবে। বরং যদি কোনো কমিটি সহিংসতার সাথে যুক্ত থাকে, তাহলে তিউনিশিয়ার আদালতের মাধ্যমে সেটি বিলুপ্ত করা উচিত। অন্যান্যদের যুক্তি হল, অবৈধভাবে আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে সহিংসতা করার বৈধতা দেওয়াটা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আর বিপ্লবের চেতনা রক্ষা করা রাষ্ট্রের একান্ত কর্তব্য।

তিউনিশিয়াকে এক ধরনের মেরুকরণের মোকাবেলা করতে হবে যা অন্যান্য আরব দেশগুলোর তুলনায় এক প্রকার চরম আকার ধারণ করতে পারে। আর সেটা হল, তিউনিশিয়ার সেকুলার উদারপন্থী এবং অতিমাত্রায় রক্ষণশীল সালাফীদের মধ্যে ব্যাপক এবং ক্রমবর্ধমান বিভেদ। তিউনিশিয়ার সেকুলাররা স্থিতিশীল নয় এবং আরব বিশ্বে তারা অতুলনীয়। বরগিবা এবং বেন আলীর অধীনে তিউনিশিয়া ছিল একমাত্র দেশ যেখানে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে হিজাব নিষিদ্ধ ছিল। অন্যদিকে, তিউনিশিয়ার সালাফী জিহাদীরা একটি পরিপূর্ণ ধর্মীয় রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখে এবং ইসলাম পরিপন্থী সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের উপর আক্রমণ করার মত মানসিকতা ইতোমধ্যে তারা দেখিয়েছে।

তিউনিশিয়ার সাথে মিশরের স্পষ্ট বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। মিশরে যেখানে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সবাই প্রায় একমত ছিল, সেখানে তিউনিশিয়ায় দুটি ভিন্ন চরম সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বের কারণে দেশটিতে একক স্বপ্ন পূরণের সুযোগ প্রায় নেই বললেই চলে। উপরন্তু, তিউনিশিয়ায় সালাফীরা বিপ্লবের আগে জেল খেটেছে এবং তারা গোপনে রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করত। এখন তারা পর্যায়ক্রমে শক্তিশালী হয়ে উঠছে। 'আনসার আল-শরিয়াহ'র নেতা আবু আইদাহসহ কারারুদ্ধ সালাফী নেতারা দেশটির বিপ্লব পরবর্তী রাষ্ট্রীয় ক্ষমার অংশ হিসেবে জেল থেকে মুক্তি পায়। এরপর থেকে তারা প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। সালাফীদের একটি গ্রুপ আনসার আল-শরিয়াহ'র ২০১২ সালের বার্ষিক সম্মেলন প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ উপস্থিত ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, খাইরুন শহরে ২০১৩ সালের অনুষ্ঠিতব্য সম্মেলনে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ উপস্থিত হবে।

উদারপন্থী এবং সালাফীদের মধ্যে এই ক্রমবর্ধমান সম্পর্কের অবনতি খুব স্বাভাবিকভাবে মধ্যপন্থী আন-নাহদা পার্টিকে তিউনিশিয়ায় প্রধান রাজনৈতিক শক্তি হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। যার ফলে, আন-নাহদার নেতাদেরকে একই সাথে উদারপন্থীরা মৌলবাদী হিসেবে আর সালাফীরা কাফের এবং স্বৈরচারী হিসেবে গালি দিয়ে থাকেন। অবশ্য এই প্রত্যেকটি সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার বিভিন্নভাবে কাজ করতে বদ্ধপরিকর। রাজনৈতিক রূপান্তর প্রক্রিয়ার অগ্রগতিই হবে তিউনিশিয়ার

অর্থনৈতিক দূরবস্থার একমাত্র সমাধান। যেমন, এর ফলে জনজীবনে স্বাভাবিকতা ফিরে আসবে, পর্যটন শিল্প আবার চাঙ্গা হয়ে উঠবে ইত্যাদি। যা হোক, ততদিনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এই রূপান্তর প্রক্রিয়ায় আর্থিকভাবে সহায়তা করতে পারে। এর সমর্থনে তারা যুক্তি দিতে পারে যে, তারা তিউনিশিয়ার রূপান্তর প্রক্রিয়াকে মডেল ধরে বিনিয়োগ করছে, যা পুরো আরব অঞ্চলের জন্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

CPRs এর বিষয়ে উভয় পক্ষই উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে। সে ক্ষেত্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জোর দেয়া উচিত। CPRs কে একটি একক কমিটি হিসেবে গণ্য করা উচিত হবে না। অথবা কমিটিগুলোর মধ্যে সবগুলোকে বহাল রাখা কিংবা রাজনৈতিক ডিক্রি জারি করে সবগুলোকে বাতিল করে দেয়া উচিত হবে না। বরং যদি কোনো একটি বিশেষ কমিটি আইন ভঙ্গ করে অথবা তার নিবন্ধনের নীতি এবং ঘোষিত লক্ষ্য বিরোধী কিছু করে তাহলে অবিলম্বে তিউনিশিয়ার বিচার কাঠামোর আওতায় এনে সেই কমিটি ভেঙ্গে দেয়া উচিত।

এছাড়াও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে দেশটির অভ্যন্তরীণ চরমপন্থা রোধ করা সম্ভব। তিউনিশদের দরিদ্রতম প্রতিবেশী তাদামুনে সহিংসতার কারণে এ বছর আনসার আল-শরিয়াহ'র সম্মেলন বাতিল করা হয়। দ্বিতীয়ত, তিউনিশিয়া মালিকি আইন শাস্ত্রের উপর নির্ভর করতে পারে। তিউনিশিয়ার 'আজ-জিতোয়ানা মসজিদ' বিশ্বে মালিকি দর্শনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। মসজিদটিতে মালিকি পন্ডিতগণ অতিরক্ষণশীল ওয়াহাবী চিন্তাধারার বিরুদ্ধে ইসলামী জ্ঞান এবং যুক্তিবৃত্তি উন্নয়নের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। চরমপন্থার বিপরীতে প্রবল প্রচেষ্টা এবং সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় তাঁরা বেশ প্রত্যয়ী।

সামনে এত সব চ্যালেঞ্জের কারণে, রূপান্তরের বিষয়ে তিউনিশিয়ার জনগণের খুব সামান্যই আস্থা রয়েছে বলে মনে হয়। তাদের সাথে কথা বললে তারা ক্রমাগত প্রশ্ন তোলে, কিভাবে তাদের বিষয়গুলো অন্য দেশের সাথে তুলনা করা সম্ভব। এত সব কিছুর পরেও তিউনিশিয়ার জনগণ আরব অঞ্চলের রূপান্তররত রাষ্ট্রগুলোর জন্য একটি মডেল হিসেবে দাঁড়িয়েছে। যা হোক, তাঁরা শুধু নতুন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সেটই তৈরি করেনি, সাথে সাথে তাঁরা জবাবদিহিতা এবং আইনের শাসনের একটি সংস্কৃতি চালু করতে সক্ষম হয়েছে। বলা যায়, আস-সাবসি এবং কামেল মারজানির মতো বিপ্লব পূর্ববর্তী জাতীয় ব্যক্তিত্বকে তিউনিশিয়ার রাজনৈতিক কার্যক্রমে সংযুক্ত করতে পারায় এক দৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

যদিও তিউনিশিয়া বিশেষ কিছু ব্যক্তির মাধ্যমে লাভবান হচ্ছে; অন্যান্য আরব দেশের উচিত অভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রীয় সংলাপের সূচনা করা, রাজনৈতিক জোট গঠন করা এবং

সংস্কারের উদ্দেশ্যে অন্তর্বর্তীকালীন বিচার আইনের খসড়া প্রস্তুত করার মাধ্যমে গোড়া থেকে পরিবর্তনের নীতি গ্রহণ করা। তিউনিশিয়ার ক্ষেত্রে এই ধরনের ধীরস্থির সামগ্রিক নীতি এবং নিয়মভিত্তিক রাষ্ট্র-গঠনের প্রক্রিয়া ঐক্যবদ্ধ এবং একটি বাস্তবভিত্তিক বিবর্তনকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করেছে। সুতরাং আরব বিশ্বের সামগ্রিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে তিউনিশিয়া একটি উৎকৃষ্ট পথ দেখাতে পারে।

অনুবাদ: মো. হাবিবুর রহমান হাবীব

রাজনৈতিক ইসলামের ব্যর্থতা দাবির সারবত্তা কতটুকু?

রশিদ ঘানুশী

[রশিদ ঘানুশী সমকালীন বিশ্বের একজন প্রাগ্রসর মুসলিম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও চিন্তাবিদ। তিনি তিউনিশিয়ার ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দল আন-নাহদার প্রধান। আরব বসন্তের প্রেক্ষিতে পতিত স্বৈরশাসক বেন আলী সরকার পরবর্তী ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক জোটের প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। গত ২৪ অক্টোবর আল জাজিরার আরবি ওয়েবসাইটে ঘানুশীর এই লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। তারপর ৩১ অক্টোবর মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক শীর্ষস্থানীয় ইংরেজি ম্যাগাজিন মিডল ইস্ট মনিটর **How credible is the claim of the failure of Political Islam?** শিরোনামে এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করে। এটি তার অনুবাদ। - সম্পাদক]

যখনই ইসলামপন্থীরা কোনো বিপর্যয়ের শিকার হয় অথবা ভোটের রাজনীতিতে সামান্য ব্যবধানে হেরে যায়, তখনই ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাস ও কার্যপদ্ধতি নিয়ে যে সকল পশ্চিমা বিশেষজ্ঞ কাজ করে তারা দাবি করে বসে যে, পলিটিক্যাল ইসলাম কার্যত ব্যর্থ ও ধ্বংস হয়েছে। তারা তাদের সকল ফোরাম ও মিডিয়ায় এই একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে এ সকল পশ্চিমা বিশেষজ্ঞদের অনুসারী মিডিয়া ও পর্যবেক্ষকরা তখন তর্কাতীত ও বাস্তব তথ্য হিসেবে এই কথাটির প্রতিধ্বনি করতে শুরু করে।

মিশরের বর্তমান ঘটনা প্রবাহ এ সকল ব্যক্তিদের সভা-সেমিনার ও দাবির জন্য যথেষ্ঠ উপাদান সরবরাহ করেছে এবং জনসম্মুখে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা কিছুটা বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়েছে ।

কিন্তু এসব দাবি কতটা যৌক্তিক ও বাস্তবসম্মত? পলিটিক্যাল ইসলাম হিসেবে যা পরিচিত তা কি প্রকৃতপক্ষে ক্রমাগত ক্ষীয়মান এবং চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ কিংবা পরাজিত হতে যাচ্ছে? নাকি নব উদ্যোগে যাত্রার জন্য কৌশলগতভাবে কয়েক ধাপ পিছনে যাচ্ছে; যা প্রকৃতপক্ষে তাদের গতিকে উর্ধ্বমুখী করবে?

০১। ইসলামপন্থীরা নিজেদের জন্য পলিটিক্যাল ইসলাম এর পরিবর্তে 'ইসলামিক মুভমেন্ট' পরিভাষাটি ব্যবহার করে। ইসলামিক মুভমেন্ট বলতে আল্লাহর সকল আইন প্রতিপালন, জীবনের সকল ক্ষেত্রে সে আইনের অনুসরণ, মানব জাতির নিকট আল-কোরআনের যে বার্তা তার বাস্তবায়ন– এসব কিছুকেই বুঝায়। পরিসংখ্যানিক তথ্য অনুযায়ী ইসলাম হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে ক্রমবর্ধমান ধর্ম এবং তার অনুসারীরা ধর্মের কারণে তাদের মূল্যবান ধন-সম্পদ উৎস্বর্গ করতে প্রস্তুত।

কাজেই পলিটিক্যাল ইসলাম বা ইসলামিক মুভমেন্ট – যাই বলিনা কেন, এটাই হচ্ছে মুসলিম সম্প্রদায়ের মাঝে সবচেয়ে বড় আন্দোলন- ধর্মীয় ভিত্তি যার রয়েছে। আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তির কারণে ইসলামিক মুভমেন্ট সম্প্রসারিত হচ্ছে অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে দ্রুত গতিতে। বিশেষ করে আদর্শিক শূন্যতা, অস্তিত্ব রক্ষার উদ্বেগ এবং পরিবার ও গোত্র প্রথার ক্ষেত্রে আধুনিক সভ্যতার দুর্বলতা- এসব কারণে ইসলামী আন্দোলন তথা পলিটিক্যাল ইসলামের গতি খুব কম বাধার সম্মুখীন হচ্ছে।

ইসলামিক মুভমেন্টের গতি বৃদ্ধির এই ঘটনা এমন সময় ঘটছে, যখন বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানরা জনগণের প্রতি তাদের যে দায়িত্ব-কর্তব্য, তা পরিত্যাগ করছে। এর ফলে সাধারণ জনগণের মাঝে উদ্বেগ ও বিচ্ছিন্নতা প্রবণতা বাড়ছে। আর এটি হচ্ছে সেকুলারাইজেশনের ক্রমাগত বৃদ্ধির একটি ফলাফল। ফলে মানুষ সেকুলারাইজেশনের পরিবর্তে সংস্থা-সংগঠনের এমন একটি কেন্দ্রের সন্ধান করেছে যেখানে দেহ ও আত্মার চাহিদা, ব্যক্তি ও সমষ্টির চাহিদা, ধর্মীয় ও পার্থিব চাহিদা এবং জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক সকল কিছুরই সন্নিবেশ আছে। ইসলামের যে সর্বব্যাপী ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি তাতে বর্তমান সমাজের প্রার্থিত এসব বৈশিষ্ট্যের সব কিছুই বিদ্যমান।

আর এসব কারণেই ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন ও ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের বিরুদ্ধে ঘৃণা, অপপ্রচার এবং দানবীয় নানা দোষ যুক্ত করার পরও বিভিন্ন পেশা ও সংস্কৃতির মানুষ ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে।

০২। সকল ধর্ম ও জাতির মাঝেই চরমপন্থী গোষ্ঠী রয়েছে। ইসলামী আন্দোলন খুব সচেতনভাবে এ চরমপন্থা ও উগ্রবাদিতা থেকে মুক্ত। মূলধারার ইসলামিক আন্দোলন ইসলামকে উপস্থাপন করেছে বিভিন্ন সভ্যতার যে অর্জন ও অবদান তার পরিপূরক ও সম্পূর্ণতা দানকারী হিসেবে। বর্তমান আধুনিক সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ এ অর্জনগুলো হলো– নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্য শিক্ষা, সুবিচার, ন্যায়নীতি, আইনের সমতা; ধর্ম বিশ্বাস-লিঙ্গভেদ-গোত্রভেদ নির্বিশেষে সবার জন্য সম-স্বাধীনতা, সকলের নাগরিক অধিকার, মানবতার মূল্যায়ন এবং রাজনৈতিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত

করা। ইসলামী আন্দোলন কখনোই এসবের বিরোধিতা করেনি। বরং আল-কোরআনে এসব অধিকার ও স্বাধীনতাকে স্বর্গীয় মানবীয় অধিকার বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে কুরআনের ঘোষণা হচ্ছে, *"আমরা নিঃসন্দেহে আদমের সকল সন্তানকে সম্মানিত করেছি।"* [সূরা বনী ইসরাইল:৭০]

০৩। ইসলামী আন্দোলন সব সময় বিশ্বাস করে- ইসলাম মানুষের সহজাত ধর্ম। তাই ইসলামী আন্দোলন মানব সমাজের সমস্যা সমাধান করতে চায় এবং মানব সমস্যার যে কোনো সমাধানে অবদান রাখতে চায়। আর এ কাজ করতে গিয়ে ইসলামী আন্দোলন ইসলামের চিন্তা-দর্শনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যে কোনো সভ্যতার অর্জিত অভিজ্ঞতা- যা মানব সমাজের সামষ্টিক স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখে- তার সাহায্য গ্রহণ করে। ইসলামী আন্দোলন মানব জাতির বিবেকবোধের সবচেয়ে কাছাকাছি এবং ইসলামী আন্দোলন তাদের নীতিবোধ, চিন্তা-চেতনা এবং ভাষার পক্ষে কথা বলে। ইসলামী আন্দোলন যদি মানব সমাজের সমস্যাবলী অনুধাবন করতে পারে এবং তা সমাধানের জন্য মানব জাতির সর্বজনীন নীতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উপায়ে তা সমাধানের চেষ্টা অব্যাহত রাখতে পারে, তবে ইসলামী আন্দোলনের সহজাত আবেদন নিঃসন্দেহে সকল বিতর্ক ও অপপ্রচারকে ছাড়িয়ে যাবে।

০৪। বিগত অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে ইসলামী আন্দোলনগুলো বিশ্বব্যাপী ক্রমাগত নির্যাতনের শিকার হচ্ছে এবং বিরামহীনভাবে এ নির্যাতনের মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

০৫। ইসলামী আন্দোলনের উপর ক্রমাগত নির্যাতনের অনেক ইতিবাচক ফলাফল রয়েছে। যেমন- আন্দোলনের একটি উত্তরাধিকার প্রজন্ম তৈরি হয়েছে। ইসলামপন্থী আন্দোলনের মধ্যে বিদ্যমান দল বা গোষ্ঠীগুলো নিজেদের মধ্যে পরস্পর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে যুক্ত হচ্ছে এবং বিগত তিনটি জেনারেশনের ভেতর ইসলামী আন্দোলনের অংশীদারিত্বমূলক অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে।

ইসলামী আন্দোলনের উপর চালানো অকথ্য নির্যাতনের ফলে তারা অতিরিক্ত সুবিধা হিসেবে অন্য যে কোনো রাজনৈতিক দলের তুলনায় জনগণের সহানুভূতি অর্জন করেছে। কারণ, অন্যায়-অবিচারের বিপক্ষে ইসলামী আন্দোলনের এই ত্যাগ-তিতিক্ষাকে সাধারণ মানুষ স্মরণ রাখছে এবং মূল্যায়ন করছে ।

০৬। বর্তমানে ইসলামী আন্দোলন অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থানে রয়েছে। কারণ, ইসলামী আন্দোলন শুধুমাত্র জনগণের আর্দশগত ও সংস্কৃতিগত চিন্তাকেই সম্মান করছে না। বরং জনগণের মৌলিক মানবাধিকার ও

ভোটের যে অধিকার রয়েছে তা সংরক্ষণ করার জন্য লড়াইও করছে,বিশেষ করে মিশরের ক্ষেত্রে।

তদুপরি, তারা গৌরবান্বিত বিপ্লবকে সমুন্নত রেখেছে। এই বিপ্লবের অন্যতম ফসল হিসেবে গণমাধ্যমের স্বাধীনতাকে তারা নিশ্চিত করেছে, যদিও পরবর্তীতে সামরিক অভ্যুত্থানকারীরা এই স্বাধীনতাকে খর্ব করেছে। এর পাশাপাশি ব্রাদাহুডের নেতৃত্বে পরিচালিত বিপ্লব রাজনৈতিক বহুত্ববাদিতাকে (Political Pluralism) প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাছাড়া ফিলিস্তিন ইস্যুর মতো প্রধান জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোতেও তারা সোচ্চার হয়েছে।

অন্যদিকে, ওয়াফদা পার্টিসহ তথাকথিত উদারপন্থী দলগুলো প্রতি-বিপ্লবের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। এটা করতে গিয়ে তারা সামরিক অভ্যুত্থানকারীদের সাথে আতাঁত করেছে এবং তাদের সমর্থন দিয়েছে। সেনাবাহিনী যখন বন্দুকের নলের মুখে জনগণের ভোটাধিকার কেড়ে নিচ্ছে, জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করছে, মানুষের লাশকে পৃষ্ঠ করছে, গণমাধ্যমের টুঁটি চেপে ধরছে; জেলখানাগুলো যখন রাজনৈতিক বন্দিতে পূর্ণ; যখন বেসামরিক জনগণ অকারণে গুলির স্বীকার হচ্ছে– তখন তথাকথিত উদারতাবাদী দলগুলো এ সব ঘৃণ্য অপকর্মকে নির্লজ্জভাবে সমর্থন ও সহযোগিতা করেছে।

একজন নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে এমন একটি বিষয়ে অভিযোগ আনা হয়েছে, যেটি তাদের অন্যতম জাতীয় ইস্যু। যেমন, ফিলিস্তিন সংকট। প্রেসিডেন্টকে পদচ্যুত করাকে বৈধতা দানের জন্য হামাসের সাথে সহযোগিতার 'অভিযোগ' তোলা হয়েছে। স্পষ্টতই ইসরাইলকে সন্তুষ্ট করার জন্য এটা করা হয়েছে।

তথাকথিত মিশরীয় অভিজাত আধুনিকতাপন্থী এবং তাদের আরব দোসররা, যারা অবৈধ অভ্যুত্থানে হাততালি দিয়েছে, তাদের এ কাজ কি গণ আত্মহত্যার শামিল নয়? এর পাশাপাশি ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের অবস্থানকে যদি আমরা তুলনা করি, তাহলে দেখা যাবে, এসব মহান ব্যক্তিগণ স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে রাস্তায় দাঁড়িয়েছে, যখন তাদের হাতে ঈমান ছাড়া অন্য কোনো অস্ত্র নেই।

ঐতিহাসিক, কৌশলগত এবং জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কোনো ভাবেই কি আমরা নৃশংস সামরিক ক্যু-এর সমর্থনকে উদারতাবাদী, প্রগতিশীল, জাতীয়তাবাদী ও সেকুলারদের বিজয় বলতে পারি? এবং সামরিক শাসনের নির্যাতন-নিষ্পেষণ ও একগুঁয়েমির কারণে যা হয়েছে, তাকে কি পলিটিক্যাল ইসলাম তথা ইসলামী আন্দোলনের পরাজয় বা মৃত্যু বলে বিবেচনা করতে পারি?

০৭। প্রকৃতপক্ষে মিশরে যা ঘটেছে তা কোনো ভাবেই ইসলামী আন্দোলনের পতন নয়। এটি বরং আরব জাতীয়তাবাদ ও সেকুলারদের পরাজয় । যদি তারা তাদের অবস্থার পরিবর্তন করে জনগণের সারিতে না আসে– তাহলে তাদের অতীত ভূমিকার পতন ঘটবে।

ইতোমধ্যে মিশরের সামরিক এই ক্যু ইসলামী আন্দোলনের জন্য অনেক বাড়তি সুযোগ নিয়ে আসবে। ইসলামী আন্দোলন রাষ্ট্র পরিচালনায় তাদের গৃহীত নীতির পূনর্মূল্যায়ন করতে পারবে এবং তাদের ভুলগুলো সংশোধন করতে পারবে। মিশরসহ যে কোনো দেশের ক্ষেত্রেই ইসলামী আন্দোলন বিরোধী দলগুলোর সাথে যোগাযোগ আরও বাড়াতে শিখবে। বিশেষ করে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে সরকার পরিচালনা যে একটি দল দ্বারা হওয়া উচিত নয় অথবা রাষ্ট্রীয় সংবিধান প্রণয়নের বিষয়টি যে একটি দল বা একই ধারার দলসমূহের দ্বারা প্রণীত হওয়া ঠিক নয়– এসব বিষয়ে ইসলামী আন্দোলন অধিকতর অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পাবে।

মিশরসহ সকল দেশের ইসলামী আন্দোলন এই বাস্তবতা উপলব্ধি করবে যে, জাতীয় পর্যায়ের অন্যান্য দলের সাথে সহযোগিতা এবং তাদের জোটে অন্তর্ভুক্তিই যথেষ্ট নয়। বরং ইসলামী দলগুলোর নেতৃত্বের পর্যায়েও তাদেরকে স্থান দিতে হবে। কারণ ইসলাম হচ্ছে গোটা জাতির সম্পদ ।

০৮। যদিও মুসলিম ব্রাদারহুড মিশরের সামরিক স্বৈরশাসকদের দ্বারা ধারাবাহিকভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছে, বিশেষ করে জামাল আব্দেল নাসেরের হাতে। তবে গুণগত কিংবা পরিমাণগত- যেভাবেই বিবেচনা করা হোক না কেন, জেনারেল আল সিসির হাতে বর্তমানে তারা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে, তা কোনোভাবেই তুলনীয় নয়। বিগত ষাট বছরে মিশরে ৬০ জনের বেশি শহীদ হয়নি। কিন্তু জেনারেল সিসির হাতে শুধুমাত্র মিশরের প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের সামনেই এর চাইতে বেশি লোক শহীদ হয়েছে। এর পরেই আমরা শুনতে পেলাম হাজার হাজার লোকের শাহাদাতের সংবাদ, আহত হবার এবং জেলে যাবার ঘটনা। সিসির এই নির্যাতনই তার সামরিক বৈধতার দুর্বলতাকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ করছে। জেনারেল সিসি জনগণের শান্তিপূর্ণ ও বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধকে দমন করার জন্য নির্যাতনের মাত্রা ক্রমাগত বাড়িয়েই চলছে ।

০৯। জামাল আব্দেল নাসের এবং জেনারেল সিসির মধ্যে পার্থক্য এই যে, জামাল আব্দেল নাসের বিরোধী দলের উপর একদিকে যেমন নির্যাতন করার পাশাপাশি জনগণের জন্য অনেক বড় বড় প্রকল্প গ্রহণ করেছিল। যদিও এসব কতটুকু ফলপ্রসু ছিল ত প্রশ্নসাপেক্ষ।

রাজনৈতিক বিরোধীদের উপর চালানো দমন-নিপীড়ন ঢাকবার জন্য জামাল নাসের অসংখ্য আকর্ষনীয়, চিত্তাকর্ষক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রকল্প গ্রহণ করেছিল।। যেমন- কৃষি সংস্কার প্রকল্প, শিক্ষার প্রসার, আল-আযহারের সম্প্রসারণ, ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা, আরব জাতিকে একত্রীকরণ, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা এবং জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন গঠনে ভূমিকা পালন ইত্যাদি ।

বিপরীতে, আল-সিসি তার জনগণ ও জাতির জন্য কি প্রকল্প গ্রহণ করেছে? কিছুই করেনি। বরং আল-সিসি তার দমন-পীড়ন ঢাকবার জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক শঠতা অবলম্বন করেছে এবং একজন নির্বাচিত বৈধ প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে হামাসের সাথে সহযোগিতার মতো নিম্নমানের অভিযোগ এনেছে।

১০। আধুনিক যুগে স্বৈরশাসকদের নির্যাতন সংঘটিত হচ্ছে মিডিয়ার সার্বক্ষণিক নজরদারির আওতায়। অতীতে ফারাও সম্রাটদের সময় এ জাতীয় নির্যাতন সংঘটিত হতো অনেকটা সংগোপনে এবং পর্দার অন্তরালে। এ কারণে হযরত মূসা (আ) এর সময়ে তৎকালীন ফেরাউনের পক্ষে বলা সম্ভব হয়েছিল, *"[মুসা (আ) বললেন,]* **হে আমার কওমের লোকেরা, আজ তোমরা বাদশাহীর অধিকারী এবং ভূ-ভাগের বিজয়ী শক্তি। কিন্তু আল্লাহর আযাব যদি আমাদের ওপর এসে পড়ে তাহলে আমাদেরকে সাহায্য করার মতো কে আছে? ফেরাউন বললো, আমি যা ভাল মনে করছি সে মতামতই তোমাদের সামনে পেশ করছি। আর আমি তোমাদেরকে সঠিক পথের নির্দেশনাই দিচ্ছি।***"** [মু'মিন:২৯] দৃশ্যত, তথ্য গোপনের মাধ্যমে ফারাও রাজা জনগণের উপর তার নিয়ন্ত্রণ রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

ইতিহাসের সেই সময়টি অনেকদিন আগেই গত হয়েছে। বর্তমানের স্বৈরশাসকরা বড় বড় অপরাধগুলো আমাদের চোখের সামনে সংঘটিত করছে। যার কারণে আল-সিসি এবং তার মতো অন্যান্যদের পক্ষে তথ্যের এই অবাধ প্রবাহের ফলে সচেতন মহলকে বোকা বানানো সম্ভব হচ্ছে না।

ফলাফল:

এতোক্ষণের আলোচনার প্রেক্ষিতে আমি পূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, মিশর কিংবা পৃথিবীর যে কোনো দেশেই পলিটিক্যাল ইসলাম পরাজিত হয়নি। অতীতের যে কোনো সময়ের চাইতে দর্শন ও চিন্তার জগতে ইসলাম আজ আরও শক্তিশালীভাবে দৃশ্যমান। যদিও আধুনিকতা তার সর্বশক্তি দিয়ে উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়ে ইসলামকে কোনঠাসা করার চেষ্টা করলেও ব্যক্তি স্বাধীনতা, উন্নয়ন, সুবিচার, ঐক্য অথবা ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা– সবক্ষেত্রেই তাদের গৃহীত পদক্ষেপ কার্যত ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতার কারণে ইসলাম প্রসংগটি বার বার সামনে উঠে

এসেছে এবং আধুনিকতার ইতিবাচক দিকগুলোকে অস্বীকার না করে এসব প্রকল্প বাস্তবায়নে ইসলামের ভূমিকা কী হবে সে বিষয়টি আলোচিত হচ্ছে।

পলিটিক্যাল ইসলাম বা ইসলামী আন্দোলন বলতে যা বুঝানো হচ্ছে তা কোনো ভাবেই উপেক্ষা করার মতো নয়। বরং ইসলামী আন্দোলন তার নীতি ও কৌশলের ভুল-ত্রুটিসমূহ সংশোধনের পর্যায় অতিক্রম করে নতুন বিপ্লবের প্রস্তুতি নিচ্ছে। আর এর আশু ফলাফল হবে জন নন্দিত কার্যকর সরকার ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। তথ্য প্রবাহের এই যুগে নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অঙ্গীকারশুন্য সামরিক অভ্যুত্থানের কারণে ইসলামী আন্দোলনকে এখন আর যুগের পর যুগ অপেক্ষা করতে হবে না।

এটি অনস্বীকার্য যে, ইসলামী আন্দোলনের শিকড় সংশ্লিষ্ট সমাজ ও রাষ্ট্রের গভীরে প্রোথিত। ইসলামী আন্দোলন শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক বিপ্লবের চেতনা ও ভারসাম্যপূর্ণ গণতান্ত্রিক উত্তরণে বিশ্বাস করে। যার ফলে, বিশ্বব্যাপী ইসলামী আন্দোলনসমূহ স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও আগ্রাসনের বিরোধিতা করে আসছে। এর মাধ্যমে তারা ইসলাম ও আধুনিকতার সুসামঞ্জস্য সম্পর্ক স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। কেননা তারা বিশ্বাস করে,

> "... এবং নিঃসন্দেহে সকল ক্ষমতার মালিক আল্লাহ এবং সব কিছুরই উপর তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। যদিও অধিকাংশ মানুষই তা অবগত নয়।"
>
> (সূরা ইউসূফ: ২১)

অনুবাদ: আবু সুলাইমান

সেকুলারিজম, ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক

রশিদ ঘানুশী

[রশিদ ঘানুশী তিউনিশিয়ার আননাহদা পার্টির প্রেসিডেন্ট। Center for the Study of Islam and Democracy (CSID)-র আয়োজনে ২০১২ সালের ২ মার্চ অনুষ্ঠিত এক সিম্পোজিয়ামে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক একটি ভাষণ দেন। এই ভাষণের উপর প্রাণবন্ত ও খোলামেলা আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এতে শীর্ষস্থানীয় স্কলার, অ্যাক্টিভিস্ট, সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দ এবং রাজনীতিবিদসহ মরক্কো, আলজেরিয়া, মিশর ও আমেরিকান দূতাবাসের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

বক্তব্যটি আরবি থেকে ট্রান্সক্রিপ্ট করে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন সিএসআইডির কর্মকর্তা ব্রাহিম রওয়াবাহ। সিম্পোজিয়ামের শুরুতে সিএসআইডির প্রেসিডেন্ট ড. রেদওয়ান মাসমোদী সংক্ষেপে অনুষ্ঠানের প্রেক্ষাপট বর্ণনাপূর্বক ঘানুশীর পরিচয় তুলে ধরেন। - সম্পাদক]

ড. রেদওয়ান মাসমোদীর ভূমিকা

ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ, সম্মানিত অতিথিবৃন্দ!

আমরা আপনাদেরকে সিএসআইডির সিম্পোজিয়ামে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। আমন্ত্রণ গ্রহণ করে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করায় আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা আশা করছি সংলাপ ও জাতীয় ঐক্যের পথ ধরে সফলভাবে তিউনিশিয়ার গণতান্ত্রিক উত্তরণ ঘটবে। এই মুহূর্তে তিউনিশিয়া এক ঐতিহাসিক পরীক্ষার মুখোমুখি। এই পরীক্ষার ফলাফল শুধু আমাদের দেশেরই ভাগ্য নির্ধারণ করবে না, আরববিশ্বের ভাগ্যও নির্ধারণ করবে। এ জন্যে সবার দৃষ্টি এখন তিউনিশিয়ার দিকে। আমি সম্প্রতি জর্ডান, মিশর ও আলজেরিয়া সফর করেছি। বিশ্বাস করুন, বিশাল প্রত্যাশা নিয়ে তারা সবাই তিউনিশিয়া বরাবর দিকে তাকিয়ে আছে। আরব বসন্তের মাধ্যমে তিউনিশিয়া ইতোমধ্যে মুক্তি ও মর্যাদা ফিরে পেয়েছে। প্রতিবেশী ও অন্যান্য

আরবদেশগুলো তিউনিশিয়াকে অনুসরণ করছে। তারা আমাদের কাছে অনেক কিছুই আশা করছে। আত্মমর্যাদা, মানবাধিকার, ন্যায়বিচার ও আরব-ইসলামী মূল্যবোধের সমন্বয়ে একটি সত্যিকারের গণতান্ত্রিক তিউনিশিয়ায় উত্তরণে সবাই প্রতীক্ষা করছে।

ধর্ম ও রাষ্ট্রের সাথে সেকুলারিজমের সম্পর্ক খুবই জটিল। একই সাথে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুও বটে। আমরা একটি নতুন গঠনতন্ত্র ও সরকার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে যাচ্ছি। এটি হবে এমন একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যা মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে বলে আমরা আশা করছি। ঠিক এমনই একটা সময়ে আমরা বিষয়টির সম্মুখীন হয়েছি।

আন-নাহদার প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক রশিদ ঘানুশীকে আমন্ত্রণ জানাতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত। তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার কিছু নেই। তারপরও স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য বলছি – তিনি 'দ্য মুভমেন্ট অব ইসলামিক টেনডেন্সি'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। এটিই পরবর্তীতে আন-নাহদা মুভমেন্ট এবং বিপ্লবের আগে আন-নাহদা পার্টি হিসেবে পরিচিত হয়। এখন পর্যন্ত ঘানুশীই এর প্রধান নেতা। তিনি এই আন্দোলনের অন্যতম তাত্ত্বিক ও চিন্তাবিদও বটে। আরব বিশ্বসহ পুরো বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনগুলোর মধ্যে শীর্ষ চিন্তাবিদ হিসেবেও তিনি পরিচিত। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও এগুলোর সাথে ইসলামের সম্পর্ক নিয়ে তিনি ব্যাপক লেখালেখি করেছেন।

গণতন্ত্র ও মুক্তির জন্য সংগ্রাম এবং স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থানের কারণে ঘানুশীকে চড়া মূল্য দিতে হয়েছে। তাঁকে মৃত্যুদণ্ডও দেয়া হয়েছিল। আল্লাহর প্রতি শোকরিয়া, তিনি এখন এই দেশেই আমাদের মাঝে অবস্থান করছেন সবার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পাত্র হয়ে। অথচ যিনি তাঁকে দণ্ড দিয়েছিলেন, তিনিই এখন নির্বাসিত জীবনযাপন করছেন।

ঘানুশীর কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ হলো – 1) Our Way to Civilization, 2) Us and the West, 3) The Right to Differ and the Duty of Unity, 4) The Palestinian Issue at a Cross Road, 5) Women Between the Quran and the Reality of Muslims, 6) From the Islamic Thought in Tunisia, 7) Public Freedoms in the Islamic State, 8) Predestination in Ibn Taymiyya's Thought, 9) Contemplations on secularism and Civil Society, 10) The Islamist Movements and Points of Change, 11) From the Experience of the Islamist Movement in Tunisia, and 12) A Rebellion of Silence.

আশা করি, তাঁর ব্যাপারে এই সংক্ষিপ্ত পরিচিতিই যথেষ্ট। অধ্যাপক রশিদ ঘানুশী, আপনাকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্যে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

রশিদ ঘানুশীর বক্তব্য

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহর রাসূল (সা.), তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবী ও উম্মতের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ, ভাই ও বোনেরা– আসসালামু আলাইকুম।

তিউনিশিয়ার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ও বিদেশী অতিথিদের সামনে এই সন্ধ্যায় আমাকে কিছু বলার সুযোগ দেয়ার জন্য আমি সিএসআইডিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আপনাদেরকে জ্ঞান দিতে এখানে আসিনি। আজকের নির্ধারিত বিষয়ে নতুন করে বলার মতো কিছু নেই। তবুও একটি সাধারণ ঐক্যমত্যে পৌঁছার লক্ষ্যে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে আমরা আরেকটু যাচাই করে নিতে পারি। এটি হয়তো আমাদের নেতৃবৃন্দকে সার্বজনীন ঐক্যমত্য, কিংবা অন্ততপক্ষে কাজ চালিয়ে নেয়ার মতো ঐক্যমত্যে পৌঁছতে সাহায্য করবে।

আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো ইসলামের সাথে সেকুলারিজমের সম্পর্ক। এক দৃষ্টিতে বিষয়টি বেশ জটিল। এই সম্পর্ক কি দ্বন্দ্ব ও অনৈক্যের? নাকি সম্প্রীতি ও সাযুজ্যতার? প্রাসঙ্গিক বিষয় হিসেবে আরো কিছু প্রশ্ন এসে যায়। যেমন: সরকারব্যবস্থার সাথে ইসলামের সম্পর্ক কী? ইসলাম ও আইনের মধ্যকার সম্পর্ক কী? এই প্রশ্নগুলো তর্কসাপেক্ষ ব্যাপার।

সেকুলারিজম ও ইসলাম নিয়ে কথা বলার সময় মনে হতে পারে– তুলনামূলকভাবে সহজ ও স্পষ্ট কোনো তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলছি। অথচ এ বিষয়গুলো নিয়ে লোকজনের মাঝে যথেষ্ট অস্পষ্টতা রয়েছে, রয়েছে নানা ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি। তারমানে হলো, সেকুলারিজমের শুধু একটি ধরনই রয়েছে, তা নয়; বরং এর নানা ধরন রয়েছে। ইসলামের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। কে, কোন উদ্দেশ্যে, কী প্রস্তাব করছে– এর ভিত্তিতে ইসলাম ও সেকুলারিজমের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে।

সেকুলারিজমের উৎপত্তি

সাদামাটাভাবে মনে করা হয়– সেকুলারিজম একটি দর্শন এবং আদর্শবাদী ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি মোকাবেলার ক্ষেত্রে একটি দার্শনিক চিন্তা। প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা তা নয়। ইউরোপে সৃষ্ট নানা ধরনের সমস্যার একটি নিয়মতান্ত্রিক সমাধান হিসেবে পাশ্চাত্যে

সেকুলারিজম হাজির হয়। ক্রমান্বয়ে এর বিবর্তন ও রূপায়ন ঘটে। নিছক দর্শন বা অধিবিদ্যাগত ব্যাপার হিসেবে এর উদ্ভব হয়নি। সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলোর অধিকাংশ সৃষ্ট হয়েছে প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিষ্টানরা আলাদা হয়ে যাওয়ার ঘটনা থেকে। এর ফলে ক্যাথলিক চার্চের একাধিপত্য খর্ব হয়ে যায়। ১৬-১৭ শতকে ইউরোপের সংঘটিত ধর্মযুদ্ধগুলোও এই সমস্যার অন্যতম কারণ। এরই প্রেক্ষাপটে সেকুলারিজমের উদ্ভব ঘটে।

এখানে প্রাসঙ্গিক একটি প্রশ্ন হলো– যেসব প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সেকুলারিজমের সূচনা হয়েছে, আমাদের এখানে কি সেসব পর্যায় এসেছে? এই সমগ্র প্রক্রিয়ার মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিলো রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতার প্রসঙ্গ। যেমন: ধর্মের ব্যাপারে নিরপেক্ষতা এবং মানুষের বিবেচনাবোধের ওপর হস্তক্ষেপ করা হতে বিরত থাকা। এর ফলে রাষ্ট্রক্ষমতা সামাজিক ব্যাপারে সীমাবদ্ধ হয়েছে এবং ধর্মের পরিধি ব্যক্তিগত ব্যাপারে সীমিত থেকেছে।

যুক্তরাষ্ট্রে ধর্মের ভূমিকা

যুক্তরাষ্ট্রে সামাজিক জীবনে ধর্মীয় হস্তক্ষেপ সুস্পষ্ট। রাষ্ট্র ও ধর্মের পৃথকীকরণ সত্ত্বেও সেখানে ধর্মের তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। সেখানকার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাদের বক্তৃতায় উল্লেখযোগ্য হারে ধর্মকে ব্যবহার করেন। তাদের সকল নির্বাচনী প্রচারণায় ধর্ম একটি আলোচিত বিষয়। স্কুলে প্রার্থনা করা এবং গর্ভপাতের অধিকারের মতো বিষয়গুলো নিয়ে প্রত্যেক দলেরই নিজস্ব বক্তব্য থাকে।

সেখানকার এই বাস্তবতার পেছনে একটা ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে। আমেরিকা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো ইভানজ্যালিক খ্রিষ্টানদের দ্বারা। তারা ইউরোপের ক্যাথলিক চার্চের নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্যে স্বীয় ধর্মবিশ্বাস নিয়ে আমেরিকায় পালিয়ে এসেছিলো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তারা 'প্রমিজড ল্যান্ড' তথা 'প্রতিশ্রুত ভূমি' হিসেবে বিবেচনা করেছিলো। তাদের মতে, এই স্বপ্নভূমির কথা তাওরাত ও গসপেলে বর্ণিত রয়েছে।

ফ্রাঙ্কো-আমেরিকান চিন্তক টকুইভেল একবার মন্তব্য করেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে ক্ষমতাধর রাজনৈতিক দল হচ্ছে চার্চ। সেখানে চার্চ যে রকম ব্যাপক ক্ষমতা ভোগ করে, ইউরোপে তা দেখা যায় না। যুক্তরাষ্ট্রে চার্চে প্রার্থনাকারীর সংখ্যা ৫০ শতাংশ ছাড়িয়ে গেলেও ইউরোপে তা ৫ শতাংশেরও কম।

ইউরোপে ধর্মের ভূমিকা

ইউরোপীয় প্রেক্ষাপটেও ধর্মের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। এখানে ফ্রেঞ্চ ও অ্যাংলো-স্যাক্সন নামে দুইটি ধারা বিদ্যমান। অ্যাংলো-স্যাক্সন ধারায় ব্রিটিশ

রাণী পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ধরনের শক্তির প্রতীক। অন্যদিকে, ফ্রান্সে ধর্ম ও রাষ্ট্র সম্পূর্ণ পৃথক। চার্চ ও রাষ্ট্রের বিপ্লবীদের মধ্যে সংঘাতের যে ইতিহাস ফ্রান্সের রয়েছে, তার পরিণতি হিসেবে এই পৃথকীকরণ ঘটেছে। তাহলে ইউরোপেও আমরা সেকুলারিজমের একক ধরন দেখছি না। আমাদের বুদ্ধিজীবীরা তো বটেই, এমনকি ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীরাও সেকুলারিজমের শুধু ফরাসী ভার্সন দ্বারা প্রভাবিত। ফ্রেঞ্চ ব্যাখ্যা অনুসারে, জনপরিমণ্ডল থেকে ধর্ম সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকবে। রাষ্ট্রই হবে জাতীয় পরিচয়ের একমাত্র শর্ত। জনপরিমণ্ডল থেকে ধর্ম ও এর প্রতীকগুলোকে বাদ দেয়ার এই মূলনীতির কারণে শুধু ফ্রান্সে হেডস্কার্ফ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অন্য কোনো ইউরোপীয় দেশে এ ধরনের মূলনীতি না থাকায় সেসব দেশে হেডস্কার্ফ নিয়ে এ ধরনের কঠোর অবস্থান দেখা যায় না। নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ফলে শুধু ফ্রান্সেই রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যে এই বিশেষ অবস্থা তৈরি হয়েছে।

অন্যদিকে, আমরা সাধারণত সেকুলার ওয়ার্ল্ডভিউর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবনটির দিকে দৃষ্টি দেই না। সেটি হলো রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা সম্পর্কিত সেকুলার বোঝাপড়া। এর মানে, রাষ্ট্র হচ্ছে ধর্মীয়, রাজনৈতিক বা সব ধরনের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদানকারী। রাষ্ট্র নির্দিষ্ট কোনো দলের পক্ষ হয়ে কোনো বিষয়ে নাক গলাবে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বিভিন্ন ধর্মের ব্যাপারে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতার মতো ব্যাপার কি ইসলামে আছে?

ইসলাম একটি সমন্বিত ব্যবস্থা

ইসলাম হচ্ছে রাজনীতি, ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্মিলিত ব্যবস্থা। মহানবী (সা.) ধর্মের সাথে সাথে রাষ্ট্রেরও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। মদীনা থেকে মক্কায় আগত যে দলটি প্রথমে আনুগত্যের শপথ (আকাবার প্রথম শপথ) করেছিলো, তা ছিলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা.) প্রতি ঈমানের ধর্মীয় শপথ। কিন্তু দ্বিতীয়বারের শপথ (আকাবার দ্বিতীয় শপথ) ছিলো মদীনা আক্রান্ত হলে প্রয়োজনে তরবারী দিয়ে হলেও মুসলমানদেরকে রক্ষা করা সংক্রান্ত। ইসলামপূর্ব সময়ে মদীনা পরিচিত ছিলো ইয়াসরিব হিসেবে। মোহাম্মদ (সা.) সেখানে হিজরত করার পর নাম পাল্টে রাখা হয় মদীনা। এই পরিবর্তন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মদীনা অর্থ শহর বা নগর। এই নামের মধ্যেই নিহিত রয়েছে– ইসলাম নিছক কোনো ধর্ম নয়, বরং এটি একটা সভ্যতা সংক্রান্ত ব্যাপার। ইসলাম মানুষকে যাযাবর জীবন থেকে নাগরিক জীবনে নিয়ে এসেছে। তাই নগরব্যবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে যাবার পর যাযাবর জীবনে ফিরে যাওয়াকে নিতান্তই অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হতো। তাই ইসলাম যেখানেই গেছে সেখানেই নগরের পত্তন হয়েছে। উত্তর আফ্রিকার সবচেয়ে পুরনো নগরীটি আমাদের দেশে অবস্থিত, যেটি আরবরা গড়ে তুলেছে। ইসলাম যে একটি সভ্যতা

নির্মাণকারী ধর্ম, মহানবী (সা.) কর্তৃক নগর প্রতিষ্ঠাই এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। এ ধর্ম যুদ্ধরত গোত্রগুলোকে যাযাবর জীবন থেকে সভ্য হিসেবে উন্নীত করেছে এবং একটা রাষ্ট্রের অধীনে তাদের ঐক্যবদ্ধ করেছে।

ইসলামে ধর্ম ও রাজনীতির প্রসঙ্গ

যেহেতু মহানবী (সা.) মসজিদে নামাজ পড়াতেন, তাই ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি ছিলেন ইমাম। আবার একই সাথে তিনি ছিলেন রাজনৈতিক নেতা। তিনি লোকজনের বিরোধ মীমাংসা করতেন, সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিতেন এবং বিভিন্ন সন্ধি ও চুক্তিতে স্বাক্ষর করতেন। মহানবী (সা.) মদীনায় এসে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি একটি সংবিধান উপস্থাপন করেন, যা 'সহীফাহ' নামে পরিচিত। আপনাদের কাছে এর উদাহরণ হলেন মোস্তফা।[১] এটি বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন সংবিধান। অনেকগুলো চুক্তির সমন্বয়ে প্রণীত এই সংবিধানটি ছিলো মক্কার মুহাজির ও তাদের আশ্রয়দাতা মদীনার আনসারদের মধ্যকার সম্পর্কের ভিত্তি। পরবর্তীতে ইহুদী গোত্রগুলো এই সংবিধানের আওতায় আসে।

আনসার ও মুহাজিরদেরকে একটি জাতি হিসেবে বিচেনা করা হয়েছিলো এবং ইহুদীদেরকে এ জাতিসত্তায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিলো। এ সংবিধানে দুই ধর্মীয় জাতিকে একটি একক রাজনৈতিক জাতিসত্তা হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা অন্যদের চেয়ে স্বতন্ত্র হিসেবে পরিচয় লাভ করে। এই সংবিধানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ধর্ম ও রাজনৈতিকতার মধ্যে পার্থক্য, যা বর্তমানকালের ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণ ধারণার সাথে সংগতিপূর্ণ। মোহাম্মদ সালিম আল আওয়া এবং মোহাম্মদ ওমরের মতো খ্যাতনামা স্কলারগণ এই অভিমত দিয়েছেন।

ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিষয়গুলো পৃথকভাবে এ সংবিধানে উল্লেখিত ছিলো। সেখানে বলা ছিলো, মুসলিমরা একটি ধর্মীয় জাতি (উম্মাহ) এবং ইহুদীরা আরেকটি ধর্মীয় জাতি। এই দুই পক্ষ ও পৌত্তলিকরা মিলে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি জাতি হিসেবে গঠিত হয়েছিলো। ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা সর্বদা স্পষ্ট না থাকলেও মহানবী (সা.) কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন ব্যবস্থা থেকে এই পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এরই আলোকে বলা যায়, ধর্ম হলো ইবাদত ও আনুগত্য সংক্রান্ত ব্যাপার, আর রাজনীতি হলো যুক্তি ও বিবেচনাবোধের ব্যাপার। মহানবীর (সা.) কোনো বক্তব্য

[১] এই বক্তব্যটি প্রদানকালে মোস্তফা বিন জাফর ছিলেন বিপ্লবোত্তর তিউনিশিয়ার নতুন সংবিধান প্রণয়নের জন্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত ন্যাশনাল কন্সটিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলির প্রেসিডেন্ট। তিনি এই সিম্পোজিয়ামে উপস্থিত ছিলেন।

সাহাবীদের কাছে বোধগম্য না হলে তাঁরা জিজ্ঞেস করতেন, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত ওহী, নাকি নিছক তাঁর ব্যক্তিগত মতামত। ওহী হলে তাঁরা মেনে নিতেন। আর মহানবীর (সা.) ব্যক্তিগত মতামত হলে প্রয়োজনবোধে ভিন্নমত পোষণ করতেন। রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে মহানবী (সা.) কর্তৃক বিভিন্ন সময় গৃহীত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সাহাবীরা একাধিকবার দ্বিমত পোষণ করেছেন।[২]

একদিন মদীনায় কিছু লোক খেজুর গাছের পরাগায়ণের কাজ করছিলো। মহানবী (সা.) তাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, "আমি এ কাজের কোনো সুফল দেখছি না।" লোকেরা এ কথাকে ওহী মনে করে পরাগায়ণের কাজ বন্ধ করে দিলো। ফলে সে বছর অন্যবারের তুলনায় ফলন কম হলো। তারপর তারা মহানবীকে (সা.) জিজ্ঞেস করলো, কেন তিনি এমন নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি জবাব দিলেন, তোমাদের জাগতিক ব্যাপারের লাভজনক ব্যাপারগুলো তোমরাই ভালো জানো।

ধর্মের প্রকৃত ভূমিকা

সুতরাং, কৃষি, শিল্প, সরকার পরিচালনার পদ্ধতির মতো বিষয় সম্পর্কে ব্যবহারিক নির্দেশনা প্রদান ধর্মের কাজ নয়। কারণ, অভিজ্ঞতার আলোকে সত্যে উপনীত হতে যুক্তিবোধই যথেষ্ট। ধর্মের ভূমিকা হলো মানুষের অস্তিত্ব, উৎপত্তি, গন্তব্য এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য ইত্যাদি সম্পর্কিত গভীর প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া। ধর্মের আরেকটা কাজ হলো কিছু মূল্যবোধ ও মূলনীতি প্রদান করা। এগুলো আমাদের চিন্তাভাবনা, আচরণ এবং রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়নে নির্দেশনা প্রদান করবে।

জনজীবন থেকে ধর্মকে বাদ দেওয়া অর্থে রাষ্ট্র ও ধর্মের পৃথকীকরণের ধারণা কখনোই ইসলামে ছিলো না। এ পর্যন্ত মুসলমানদের জীবনে ইসলামের প্রভাব সুস্পষ্ট। মুসলিম জনজীবন ইসলামের শিক্ষা ও নির্দেশনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ। যদিও ধর্ম ও রাজনীতির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তারা সচেতন। ইসলামী স্কলারদের চিন্তাধারায়ও এই পার্থক্য সুস্পষ্ট। তারা মুয়ামালাত (ইবাদত ব্যতীত অন্যান্য কাজ) এবং ইবাদতকে আলাদা হিসেবে বিবেচনা করেছেন। ইবাদত হচ্ছে অপরিবর্তনীয় ও প্রথাগতভাবে পালনের বিষয়। অর্থাৎ এখানে সত্যে পৌঁছার জন্যে যুক্তি যথেষ্ট নয়। আর সাধারণ কল্যাণ অনুসন্ধানের ক্ষেত্র হলো মুয়ামালাত। ইমাম শাতিবী ও ইবনে আশুরের মতো মহান স্কলারগণ জোর দিয়ে বলেছেন, ইসলাম এসেছে মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্য। স্কলারগণ একমত হয়েছেন, সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধন ও ন্যায়বিচার

[২] মহানবীর (সা) 'নবুয়তী মর্যাদা' নিয়ে শায়খ তাহের বিন আশুর ব্যাপক কাজ করেছেন। তাঁর গবেষণায় এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

প্রতিষ্ঠা করাই সকল ঐশীগ্রন্থের সর্বোচ্চ লক্ষ্য। ধর্মীয় নির্দেশনা, উদ্দেশ্য, মূল্যবোধ ও মূলনীতি অনুযায়ী পরিচালিত যুক্তিবোধের আলোকে এই ব্যাপারগুলো বাস্তবায়নযোগ্য। মুয়ামালাতের ব্যাপারগুলো প্রতিনিয়ত বিকশিত ও পরিবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু আকীদা, মূল্যবোধ ও সদগুণ সবসময়ই অপরিবর্তনীয়।

ইসলামে বহুত্ববাদ ও চিন্তার স্বাধীনতার ধারণা

ইসলামের ইতিহাসে সবসময়ই রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম কোনো না কোনোভাবে ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত ছিলো। কোনো বিশেষ স্থান-কালের লোকেরা ইসলামী মূল্যবোধকে যেভাবে বুঝেছে, তার আলোকে রাষ্ট্রের আইন প্রণীত হয়েছে। এতদসত্তেও, নিছক ঐশী আইন-কানুন দ্বারা পরিচালিত হতো বলেই কোনো রাষ্ট্র ইসলামী হিসেবে গণ্য ছিলো না। বরং, সেখানে মানবীয় বিচার-বিবেচনাও কার্যকর ছিলো, যার সমালোচনা করা যেতো। রাষ্ট্র একটা পর্যায় পর্যন্ত নিরপেক্ষতা বজায় রাখতো। রাষ্ট্র যখন এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতো এবং একটা একক ব্যাখ্যা চাপিয়ে দিতো – যেমনটা ঘটেছিলো আব্বাসীয় আমলে – তখনই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়তো।

বলে রাখা দরকার, একই ধর্মের নানা ধরনের ব্যাখ্যা ও দৃষ্টিকোণ নিয়ে আব্বাসীয় খলীফা আল মনসুর উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাঁর আশংকা ছিলো, রাষ্ট্রের উপরও এই বিভাজন প্রভাব ফেলতে পারে। তাই তিনি ইমাম মালেককে (রহ.) ডেকে আনলেন এবং সবকিছুর সমন্বয় করে একটি অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রণয়ন করার অনুরোধ করলেন। এর ফলে ইমাম মালেক (রহ.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল মুয়াত্তা' রচনা করেন। এতে খলীফা আল মনসুর খুবই খুশি হলেন। তিনি এটাকে সকল মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক আইনে পরিণত করতে চাইলেন। এতে ইমাম মালেক (রহ.) আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তিনি এ রকম কিছু না করার জন্যে খলিফাকে অনুরোধ করেন। তাঁর বক্তব্য ছিলো– মহানবীর (সা.) সাহাবীরা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছেন এবং তাঁরা ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁরা লোকজনকে পরিস্থিতির আলোকে উপযুক্ত পন্থা বেছে নেয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন।

এ কারণেই আমরা উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় একটা মাজহাব, পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে অন্য মাজহাব, আবার মিশরে আরেকটা মাজহাবের প্রাধান্য দেখি।

ধর্মীয় ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে খ্রিষ্টধর্মে চার্চই একমাত্র কর্তৃপক্ষ। ইসলামে এ ধরনের কর্তৃপক্ষ না থাকায় ব্যাখ্যাদান ও চিন্তার অর্থবহ স্বাধীনতা রয়েছে। এই স্বাধীনতার ফলে স্বভাবতই বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যাখ্যা তৈরি হয়েছে। আইন প্রণয়ন ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে এতে কোনো সমস্যা নেই। তবে আইন প্রণয়ণের ক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। নির্বাচন ও গণতন্ত্রই হচ্ছে এখন পর্যন্ত অনুসরণীয়

মানবজাতির জন্যে সর্বাধিক কার্যকর ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে জাতির নেতৃত্ব গড়ে ওঠে এবং ব্যক্তিচিন্তার পরিবর্তে সামষ্টিক মতামত প্রাধান্য লাভ করে। অন্যদিকে, খ্রিষ্টধর্মের মতো ইসলামে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে 'চার্চ' ও কোরআনের মুখপাত্র হিসেবে 'পোপ' না নেই। ফলে কোনো বিশেষ স্কলার, দল বা রাষ্ট্রের পরিবর্তে সমগ্র জাতি পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে ঐশী ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

আব্বাসীয় খলীফা আল মামুন কোরআনের একটিমাত্র ব্যাখ্যা এবং আকীদা সংক্রান্ত মুতাজিলা দর্শনকে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বিদ্রোহ করেন এবং ধর্মের ওপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের চেষ্টাকে প্রত্যাখ্যান করেন। এতে তিনি হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হন। তাঁর এই প্রচেষ্টার ফলে জনমত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চলে যায় এবং আল মামুন শেষ পর্যন্ত পিছু হটতে বাধ্য হন।

আমাদের চ্যালেঞ্জ

পাশ্চাত্যের সমস্যাগুলো আবর্তিত হচ্ছিলো ধর্ম থেকে রাষ্ট্রের মুক্তিকে কেন্দ্র করে। এটি করতে গিয়ে তারা ধ্বংসাত্মক যুদ্ধেও জড়িয়ে পড়েছিলো। অন্যদিকে, আমাদের প্রেক্ষাপটে বিবেচ্য বিষয় হলো– রাষ্ট্রের কবল থেকে ধর্মের মুক্তি এবং ধর্মের ওপর আধিপত্য করা থেকে রাষ্ট্রকে বিরত রাখা। এর পাশাপাশি ধর্মকে সামাজিক পরিমণ্ডলের মধ্যে বজায় রাখা, সকল মুসলমানের জন্য কোরআন পড়া এবং তাদের বুঝজ্ঞান অনুযায়ী কোরআন বুঝার সুযোগ রাখা আমাদের বিবেচনার বিষয়।

বহুত্ববাদে কোনো সমস্যা নেই, এটা মানুষের মধ্যে সহনশীলতা তৈরি করে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্যে মুসলমানদের প্রয়োজন গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। ইসলামে যে 'শুরা'র (পরামর্শ) ধারণা রয়েছে, তার সঠিক মূল্যায়ন করার এটাই সবচেয়ে ভালো উপায়।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, আমাদের ঐতিহ্যে চার্চের মতো কোনো একক ধর্মীয় কর্তৃত্ববাদী প্রতিষ্ঠান নেই। সম্ভবত আমাদের শিয়া ভাইয়েরা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বিশ্বাসী। কিন্তু সুন্নীদের মাঝে দ্বিমত ও ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করার মতো স্কলারদের কাউন্সিল বা এ ধরনের কোনো প্রতিষ্ঠান নেই। তাই আমাদের প্রচুর স্কলার ও বুদ্ধিজীবী দরকার, যারা মুক্ত পরিবেশে আমাদের ইস্যুগুলো নিয়ে বিতর্ক ও গবেষণা করবেন এবং নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে আইনসভাকে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হিসেবে স্বীকৃতি দেবেন।

রাষ্ট্র ও ধর্মের সম্পর্ক

আমাদের দেশে সেকুলার ও ইসলামপন্থীদের মধ্যে বিতর্ক চলছে। উভয় পক্ষই একে অপরকে চরমপন্থী হিসেবে আখ্যায়িত করছে। একটা পক্ষ রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে ইসলাম সম্পর্কে তাদের বুঝজ্ঞানকে উপর থেকে চাপিয়ে দেয়ার পক্ষপাতি। আরেকটা পক্ষ রাষ্ট্র, শিক্ষাব্যবস্থা ও জাতীয় সংস্কৃতি থেকে ইসলামের প্রভাব উপড়ে ফেলতে আগ্রহী।

মুসলিম বিশ্বসহ পুরো বিশ্বে এখন একটা ধর্মীয় পুনর্জাগরণ চলছে। পোপ দ্বিতীয় জন পল যে কার্যক্রম শুরু করেছিলেন, সেই সূত্রে পূর্ব ইউরোপে ক্যাথলিক চার্চের অধিকতর ভূমিকা দৃশ্যমান হচ্ছে। পুতিনের পক্ষে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী প্রচারণায় রাশিয়ান অর্থোডক্স চার্চের সাফল্যও লক্ষ্যনীয়। এমন এক সন্ধিক্ষণে সংস্কৃতি ও শিক্ষাব্যবস্থা সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় নীতি প্রণয়নে ধর্মের প্রভাবের বিরোধিতা করাটা অযৌক্তিক। তবে ইসলামকে চাপিয়ে দেয়ারও প্রয়োজন নেই। এটা অভিজাতদের ধর্ম নয়, এটা গণমানুষের ধর্ম। রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য নয়, বরং ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা আছে বলেই ইসলামের এত অনুসারী এবং দীর্ঘসময় ধরে এটি টিকে আছে। রাষ্ট্র বরং প্রায়শ ধর্মের উপর বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমি আগেও বলেছি, ইসলামপন্থী বা অন্যান্য ধারার সাথে যারা যুক্ত তাদের অনেকের মধ্যে রাষ্ট্রের বন্ধন থেকে মুক্ত করে ধর্মকে একটা সামাজিক ব্যাপার হিসেবে রেখে দেওয়ার ব্যাপারে এক ধরনের ভীতি কাজ করে। তাদের প্রতি আমার প্রশ্ন হলো– রাষ্ট্র কেন ইমামদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়? কেন মসজিদকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়?

রাষ্ট্রের পক্ষে নিরপেক্ষ থাকাটা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপদসঙ্কুল ব্যাপার। ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণ বলতে কী বুঝানো হচ্ছে, তার উপর নির্ভর করছে এটা গ্রহণযোগ্য নাকি বর্জনীয়। ওহীর প্রত্যক্ষ বিষয় এবং প্রায়োগিক রাজনৈতিক বিষয়ের মধ্যকার পার্থক্য প্রাথমিক যুগের মুসলিমরা যেভাবে বুঝতেন সেভাবে যদি বিবেচনা করা হয় – অর্থাৎ রাষ্ট্র হচ্ছে একটা মানবীয় ব্যাপার, আর ওহী হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত – তাহলে তা ঠিক আছে। আর যদি একে ফরাসী ধারণা কিংবা মার্ক্সীয় অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যাখ্যা করা হয়, তাহলে তা ভয়ানক বিপদজনক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। এই ব্যাখ্যা রাষ্ট্র ও ধর্ম উভয়ের জন্য ক্ষতিকর। রাষ্ট্র ও ধর্মের সম্পূর্ণ পৃথকীকরণের ফলে রাষ্ট্র মাফিয়াচক্রে পরিণত হবে, বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হয়ে পড়বে লুণ্ঠনবাদী, রাজনীতি হয়ে পড়বে প্রতারণা ও ভণ্ডামিপূর্ণ। কিছু ইতিবাচক দিক ছাড়া বাকি ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যে ঠিক এই ব্যাপারগুলোই ঘটেছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতি অল্প কয়েকজন অর্থনৈতিক দালালের খপ্পড়ে বন্দি। এরা প্রচুর অর্থের মালিক, অসংখ্য মিডিয়া তাদের হাতে। এসবের মাধ্যমে তারা রাজনীতিবিদদের নিয়ন্ত্রণ করে।

এই বিবেচনায় মানুষের জন্যে ধর্ম খুবই প্রয়োজনীয়। ধর্মের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক নির্দেশনার ফলে মানুষ ন্যায় ও অন্যায়ের (হালাল ও হারাম) মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে।[৩] হালাল-হারাম নির্ধারণে একচ্ছত্র কর্তৃত্ববাদী চার্চের ধারণা যেহেতু ইসলামে নেই, তাই এসব সমস্যা অগ্রগণ্য চিন্তাবিদগণ, জনগণ ও মিডিয়া আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করবে।

রাষ্ট্র ও রাজনীতি থেকে ধর্মকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হলে সবকিছু নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়া এবং সামাজিক সম্প্রীতি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়। অতএব, মানুষের মুক্তি ও অধিকারের নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম একটা ভারসাম্যপূর্ণ উপায় আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। ধর্মই এই কাজটি করতে পারে। এই ভারসাম্য অর্জন করতে আমাদেরকে ধর্ম ও রাজনীতির পৃথকীকরণ প্রসঙ্গে ফিরে যেতে হবে। ধর্মের কোনটা অপরিবর্তনীয়, আর কোনটা পরিবর্তনীয়– সেই মানদণ্ড ঠিক করতে হবে। আমাদের আইনপ্রণেতাদেরকে ধর্মের মূল্যবোধ সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত ও প্রশিক্ষিত হতে হবে। এমন ব্যক্তিদের দ্বারা আইন প্রণয়নের সময় ধর্মীয় স্কলারদের মুখাপেক্ষী থাকার দরকার পড়ে না। একই কথা রাজনীতিবিদদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ধর্মীয় ইবাদত পালনে বলপ্রয়োগের মধ্যে কোনো ফায়দা নেই। রাষ্ট্রীয় পেশিশক্তির মাধ্যমে আল্লাহর অবাধ্য বান্দাদের মুনাফিকে পরিণত করার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। মানুষকে স্বাধীন হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষের বাহ্যিক কিছু দিককে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হলেও তাদের অন্তরের অবস্থা ও দৃঢ় বিশ্বাসকে পরিবর্তন করা অসম্ভব।

হেডস্কার্ফ বা নেকাব হলো এক্ষেত্রে আমাদের সামনে প্রাসঙ্গিক উদাহরণ। এর দুইটা মডেল রয়েছে। প্রথমটিতে নেকাব পরিধানের রাষ্ট্রীয় হুকুম তামিল করতে বাধ্য করা হয়েছে। দ্বিতীয়টিতে রাষ্ট্র নেকাবকে নিষিদ্ধ করেছে।

একবার আমি একটি মুসলিম দেশের এয়ারপোর্টে সব নারীকেই বোরকা পরিহিত অবস্থায় দেখলাম। কিন্তু বিমানটি আকাশে উড়ার সাথে সাথে সব বোরকাও যেন উড়ে গেলো! এটা যে ওই দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ব্যর্থতা, তা স্পষ্ট। জনগণের ধর্ম পালনের নিশ্চয়তা সাধনে দেশটি দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বেন আলীর শাসনামলে তিউনিশিয়ায় নারীদের নেকাব পরা নিষিদ্ধ ছিলো। নারীরা তাদের পছন্দ

[৩] সৃষ্টিকর্তার ওপর বিশ্বাস নৈতিকতাকে উদ্দেশ্যপূর্ণ ও স্থায়ী ভিত্তি প্রদান করে। নৈতিকতার জন্যে ধর্ম অপরিহার্য শর্ত না হলেও ধর্ম বহির্ভূত নৈতিকতার কোনো বস্তুগত ভিত্তি (objective reality) পাওয়া যায় না। – সম্পাদক

অনুযায়ী পোশাক পরে জনসমক্ষে আসতে পারতো না। এখানেও রাষ্ট্র দমনপীড়ন চালিয়েছে এবং ব্যর্থ হয়েছে।

বিশ্বাসের স্বাধীনতা

ধর্মের মূল ক্ষেত্র রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি নয়, বরং ব্যক্তিগত বিশ্বাস। আর রাষ্ট্রের সর্বপ্রথম দায়িত্ব হচ্ছে জনগণের সেবা তথা কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা ইত্যাদি নিশ্চিত করা। মানুষের হৃদয়-মন নিয়ন্ত্রণ করা রাষ্ট্রের কাজ নয়। এ কারণে আমি জনগণের উপর সব ধরনের বলপ্রয়োগের বিরোধী। "ধর্মের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই"– কোরআনের এই আয়াতের উপর ভিত্তি করে আমি মানুষের নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী চলা কিংবা ধর্মত্যাগ করার স্বাধীনতার পক্ষে।

কাউকে জোর করে মুসলিম বানানোর কোনো মানে নেই। প্রকাশ্যে বিশ্বাসী, আর অন্তরে অবিশ্বাসী– মুসলিম জাতির এ ধরনের মুনাফিকের দরকার নেই। স্বাধীনতা এমন এক মৌলিক বিষয়, যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি ইসলামের ওপর অবিচল থাকতে পারে। অতএব, যিনি কালিমায়ে শাহাদাতের ঘোষণা দেন, স্বাধীন ইচ্ছার ভিত্তিতেই তিনি সেটি করেন। যার মূলে রয়েছে সচেতনতা এবং দৃঢ় বিশ্বাস।

মক্কার লোকেরা যখন মোহাম্মদকে (সা.) তাঁর ধর্মের ব্যাপারে আপত্তি জানালো, তখন তিনি তাঁর দাওয়াতী তৎপরতায় হস্তক্ষেপ না করতে তাদেরকে অনুরোধ করেন। তিনি লোকদের কাছে তাঁর বাণী প্রচারের স্বাধীনতা চাইলেন। মক্কার লোকেরা যদি তাঁকে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দিতো, তাহলে তিনি মাতৃভূমি ছেড়ে হিজরত করতেন না। তাঁর বাণী এতই শক্তিশালী ছিলো যে, তারা একে দমিয়ে রাখার জন্য বিকল্প কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছিল না। একমাত্র সত্য হওয়ার কারণে ইসলাম এতই শক্তিশালী যে, এর প্রতি আকৃষ্ট করতে মানুষের ওপর পেশিশক্তি ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে না। যাবতীয় রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ে ইসলাম ঘোষণা করে– "যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো, তাহলে প্রমাণ হাজির করো"।[৪]

শেষ কথা

আমাদের দেশে চলমান বিতর্কের অধিকাংশই সেকুলারিজম ও ইসলাম নিয়ে ভুল বুঝাবুঝির কারণে হচ্ছে। আমরা বাস্তবে দেখিয়েছি– সেকুলারিজম কোনো নাস্তিক্যবাদী দর্শন নয়। বরং বিশ্বাস ও চিন্তার স্বাধীনতাকে অক্ষুন্ন রাখতে এটা একটা প্রক্রিয়াগত ব্যবস্থা। আব্দুল ওয়াহহাব আল মাসিরি তাঁর গবেষণায় কট্টর সেকুলারিজম

[৪] সূরা বাকারা ২:১১১- (هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ)

ও উদার সেকুলারিজমের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন। কট্টর সেকুলারিজমের উদাহরণ হিসেবে ফ্রান্সের ইতিহাস থেকে জ্যাকবীয় মডেলের কথা বলা যায়। যাজকতন্ত্রের বিরুদ্ধে যখন যুদ্ধ চলছিলো, তখন জ্যাকবীয়দের প্রধান শ্লোগান ছিলো– "শেষ রাজাকে ফাঁসি দাও শেষ পাদ্রিটার দড়িতে" (strangle the last king with the entrails of the last priest)। এটা হচ্ছে ফ্রান্সের বাস্তবতা, যেটি সেকুলারিজমের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা নয়। ইসলাম নিয়েও এ ধরনের কিছু অস্পষ্টতা রয়ে গেছে। এ কারণে অনেকে মনে করে– ইসলাম শুধু মানুষের স্বাধীনতা হরণ করে বিজয়ী হতে চায় এবং জোরপূর্বক নামাজ, রোজা ও নেকাবের মতো বিষয় চাপিয়ে দিতে চায়। অথচ ইসলামের চূড়ান্ত লক্ষ্য থেকে এগুলো অনেক দূরের ব্যাপার। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা কপটতাকে সবচেয়ে বড় অপরাধ হিসেবে গণ্য করেছেন। কপট লোকদের জন্যে চিরস্থায়ী দোজখের আগুন রয়েছে বলে সাবধান করা হয়েছে।

আমরা ইতোমধ্যে বিপ্লবের মাধ্যমে একটা স্বৈরাচারকে উৎখাত করতে সক্ষম হয়েছি। এই বিপ্লব আমাদেরকে নাগরিক মূল্যবোধ মেনে চলার কথা বলে। এই দেশ নির্দিষ্ট কোনো দলের হবে না। বরং এই দেশ হবে ধর্ম, লিঙ্গ বা অন্য যে কোনো বিবেচনার ঊর্ধ্বে সকল নাগরিকের। নাগরিকদের সমঅধিকার, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ভিত্তিতে যে কোনো কিছু করার স্বাধীনতা এবং নাগরিক প্রতিনিধিদের দ্বারা সংসদে প্রণীত আইন মেনে চলার অধিকার ইসলাম আমাদেরকে দিয়েছে।

সেকুলারিজমের সাথে ইসলামের সম্পর্ক নিয়ে এই হচ্ছে আমার দৃষ্টিভঙ্গি। আশা করি আমি মূল ব্যাপারটা বলতে পেরেছি। মনোযোগ দিয়ে শোনার জন্যে আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

অনুবাদ: মাসউদুল আলম

তিউনিশিয়ার স্বপ্ন

রশিদ ঘানুশী

[২০১১ সালে আরব বসন্তের সূচনা হয়েছিল তিউনিশিয়ায়। বিপ্লবোত্তর তিউনিশিয়ার প্রথম সরকারের নেতৃত্ব দিয়েছিল ইসলামপন্থী আননাহদা। তিউনিশিয়ার গণতান্ত্রিক উত্তরণ ও রাজনৈতিক সহাবস্থানমূলক পরিবেশ তৈরিতে দলটির অগ্রগণ্য ভূমিকা রয়েছে। গত ২১-২৫ মে পাঁচ দিনব্যাপী আননাহদার দশম কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এই কনফারেন্সে ধর্ম ও রাজনীতির পৃথকীকরণ, রাজনৈতিক ইসলামের পরিচয় ত্যাগ করে মুসলিম গণতন্ত্রী পরিচয় ধারণসহ এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আননাহদা গ্রহণ করে, যা বিশ্বজুড়ে তুমুল আলোচনার জন্ম দেয়। সেই প্রেক্ষিতে সম্মেলনের উদ্বোধনী পর্বে দলটির প্রেসিডেন্ট রশিদ ঘানুশীর ভাষণটি গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া ভাষণটি বিপ্লবোত্তর একটি দেশের ঐক্য ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রনায়কোচিত ভূমিকা ও দিকনির্দেশনার নজিরও তৈরি করেছে। ঘানুশীর এই ভাষণটির অনুবাদ সংক্ষিপ্ত ও পরিমার্জিত। -সম্পাদক]

আননাহদা চরমপন্থীদের বিপক্ষে

আমরা চরমপন্থী ISIS ও 'তাকফিরি'দের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের চলমান লড়াইয়ের পক্ষে আননাহদার পূর্ণ সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করছি। তিউনিশিয়ার জনগণ অনেক ত্যাগস্বীকার করেছে। যার কারণে ঘৃণা-বিদ্বেষের চেয়ে জনগণের শক্তি অধিকতর শক্তিশালী। চরমপন্থীরা পরাজিত হবে, ইনশাআল্লাহ। বেন গার্ডেন নগরী অসাধারণ এক নজির তৈরি করেছে। তারা দেখিয়ে দিয়েছে, সন্ত্রাসবাদের কাছে জনগণ কখনোই পরাজিত হবে না। কেননা, আমাদের জাতীয় ঐক্য অত্যন্ত শক্তিশালী ও রাষ্ট্র সম্পর্কে আমাদের ধারণা খুবই স্বচ্ছ। কেউ চাইলে রাষ্ট্রীয় কোনো পদক্ষেপের বিরোধিতা বা সমালোচনা করতে পারে; কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করার মতো কোনো কিছুকে জনগণ কখনো সমর্থন করবে না।

রাজনৈতিক সফলতা, নিরাপত্তা পুনঃপ্রতিষ্ঠা, আন্তর্জাতিক সংহতি শক্তিশালীকরণ, National Dialogue Quartet-এর নোবেল শান্তি পুরস্কারের সম্মান লাভ – এসব কিছুই বিপ্লবের পথ ধরে এসেছে। আরব বসন্তের দেশগুলোর মধ্যে তিউনিশিয়াই এখনো বিপ্লবের আলোকশিখা জ্বালিয়ে রেখেছে। আরব বিশ্বেও যে গণতন্ত্র সম্ভব, আমরা তা দেখাতে পেরেছি।

ঐক্যই একমাত্র গ্রহণযোগ্য পথ

ঐক্যের নীতির প্রতি আননাহদার পূর্ণ সমর্থনের কথা আমি পুনর্ব্যক্ত করছি। যারা আননাহদার সাথে শত্রুতা বজায় রেখে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করতে চান তাদেরকে বলতে চাই – দেশকে বিভক্ত করবেন না। সবার প্রতিই আমাদের ইতিবাচক মনোভাব রয়েছে। ঐক্যই একমাত্র গ্রহণযোগ্য পথ। তিউনিশিয়ার তরীটি তখনই কেবল নিরাপদে তীরে ভীড়তে পারবে, যখন তা সকল তিউনিশিয়ানকেই বহন করবে।

সংস্কারের প্রতিশ্রুতি

বিপ্লবের আগের ও পরের ভুলত্রুটিগুলো থেকে শিক্ষা নেয়ার ব্যাপারে আননাহদা আন্তরিক। আমরা আমাদের ভুলগুলো স্বীকার করি এবং সেগুলোকে সংশোধন করার জন্য আগ্রহী। এ ব্যাপারে আমরা অকপট। আজকের কনফারেন্সে আমরা একটি 'পর্যালোচনা পর্ব' রেখেছি। আমরা এমন একটি দল, যারা স্বপ্রণোদিত হয়ে পরিবর্তন ও সংস্কারকে গ্রহণ করে। নিজেদের ভুলত্রুটি স্বীকার করার ব্যাপারে আমরা মোটেও ভীত নই।

আমরা যখন স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলাম, আমাদের আদর্শিক আন্দোলনের আইডেন্টিটি যখন হুমকির মুখে ছিল, সেই সত্তরের দশক থেকে আজ পর্যন্ত আমরা কখনোই নিজেদের বিকাশের (evolve) দরজা বন্ধ করে দেইনি। একটি জাতীয় গণতান্ত্রিক দল হিসেবে আমরা ইসলামী মূল্যবোধ, দেশের শাসনতন্ত্র ও যুগের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে সংস্কারের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সংস্কারের এই প্রতিশ্রুতি ইসলামী বৈশিষ্ট্যের দাবিদার চরমপন্থী ও সহিংস ধারার অনুসারী এবং মুসলিম গণতন্ত্রীদের মধ্যে একটা স্পষ্ট ও চূড়ান্ত পার্থক্য গড়ে দিয়েছে।

সংস্কার একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া

রাজনৈতিক ও অন্যান্য সামাজিক তৎপরতার মধ্যে পৃথকীকরণ ও বিশেষায়িতকরণ কোনো আকস্মিক সিদ্ধান্ত কিংবা সাময়িক চাপের কাছে নতি স্বীকারের কারণে হয়েছে, এমন নয়। বরং সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কাজ থেকে আলাদাভাবে

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার যে ঐতিহ্য আমাদের রয়েছে, এটা তারই ঐতিহাসিক বিকাশের একটা পর্যায় মাত্র।

আমরা ধর্মকে রাজনৈতিক লড়াই-সংগ্রাম থেকে দূরে রাখতে চাই। আমরা মসজিদগুলোকে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ থাকার আহ্বান জানাই। আমরা চাই না, মসজিদগুলো রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হোক। এই দৃষ্টিভঙ্গির ফলে মসজিদগুলো দলীয় বিভাজনের পরিবর্তে জাতীয় ঐক্য গঠনে অধিকতর ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে।

ইসলামী মূল্যবোধের উপর গুরুত্বারোপ

যাইহোক, জনজীবন থেকে ধর্মকে বাদ দেয়ার কারো কারো প্রচেষ্টা দেখে আমরা বিস্মিত হয়েছি। অথচ বাস্তবতা হলো – উপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত সংগ্রামে আমাদের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের নেতৃবৃন্দ ধর্মীয় সেন্টিমেন্টকে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজে লাগিয়েছিলেন। একইভাবে, বর্তমানে আমরাও কর্মতৎপরতা, ত্যাগস্বীকার, সত্যবাদিতা ও সততায় উৎসাহ প্রদান এবং উন্নয়নের সহায়ক হিসেবে ইসলামী মূল্যবোধকে কাজে লাগাতে পারি। ISIS ও অন্যান্য চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইয়ের পক্ষে ইসলাম একটি ইতিবাচক শক্তি। উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রের প্রচেষ্টার সমর্থনেও আমরা ইসলামী মূল্যবোধকে নিতে পারি। ইসলামের প্রতিনিধি দাবিদার ISIS-কে ইসলামী মূল্যবোধের জায়গা থেকেই প্রতিরোধ করতে হবে। এ জন্য আমাদের এমন আলেম দরকার, যারা ইসলামী মধ্যপন্থাকে সমর্থন করেন এবং ইসলামের নামে পরিচালিত চরমপন্থাকে প্রত্যাখ্যান করেন।

রাষ্ট্রের সাথে আননাহদার সম্পর্ক

দমননীতি, অপবাদ এবং ভয়ের সংস্কৃতি তৈরির মাধ্যমে স্বৈরাচারী সরকার আননাহদার সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আল্লাহর রহমতে আননাহদা ও রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা তৈরি করতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। বিপ্লবের পর আমাদের সরকার গঠনের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে, আননাহদা রাষ্ট্রের অংশ এবং গুরুত্বপূর্ণ সমর্থনের উৎস। আননাহাদ পরিচালিত সরকার সে সময়ে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। এ থেকে প্রমাণ হয়, আমরা ক্ষমতালিপ্সু, কর্তৃত্বপরায়ণ কিংবা ক্ষমতার একচ্ছত্র অধীকারী হতে ইচ্ছুক নই।

সুষম রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েমই লক্ষ্য

তিউনিশিয়ান রাষ্ট্র এমন একটি জাহাজ, যা সর্বাবস্থায় কোনো ধরনের বৈষম্য ও প্রান্তিকীকরণ ব্যতিরেকে সর্বস্তরের তিউনিশিয়ান নারী-পুরুষকে ধারণ করবে।

আমরা এমন একটা সুষম রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করতে চাই, যে রাষ্ট্র আইন পরিষদ ও বিচারিক ক্ষমতার তত্ত্বাবধান এবং সিভিল সোসাইটি ও মিডিয়ার পর্যবেক্ষণের মধ্যে থেকে আইনের প্রয়োগ ও সংবিধানের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে সক্ষম হবে এবং এর মাধ্যমে মানুষের স্বাধীনতার সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে। তা না করা গেলে রাষ্ট্র গঠনটাই উদ্দেশ্য ও মূল্যহীন হয়ে পড়বে।

প্রশাসনিক সংস্কার

স্বাধীনতা মানে নৈরাজ্য নয়। অন্যদিকে, রাষ্ট্রক্ষমতা মানে দমনপীড়ন ও কণ্ঠরোধ করা নয়। আমাদের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রের কর্মচারীদের ভূমিকা পুনর্মূল্যায়ন করা, তাদের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করা, রুটিন কাজের মানসিকতা দূর করা ও কর্মক্ষমতা বাড়াতে নানা ধরনের উৎসাহ প্রদান করা বিপ্লবের পরিপূর্ণতার জন্যই দরকারী। অতীতের মতো 'আগামীকাল আসুন', 'আজকে আর হচ্ছ না', 'কিছু উপরী দেন' এ ধরনের কথা বলা যাবে না।

জনপ্রশাসনের কর্মচারীদের মর্যাদা রাষ্ট্রের মর্যাদারই অংশ। কোনো অর্থনৈতিক বা সামাজিক পুনর্জাগরণই সত্যিকারের প্রশাসনিক সংস্কার ব্যতীত স্থায়ী হতে পারে না। এই সংস্কারের মধ্যে রয়েছে মান্ধাতার আমলের কাগুজে প্রশাসনকে (paper administration) পরিপূর্ণ ডিজিটাল প্রশাসনে রূপান্তর করা। এই সংস্কার তখনই স্বার্থক হবে, যখন একজন ব্যবসায়ী কিংবা তরুণ উদ্যোক্তা এক দপ্তর থেকে আরেক দপ্তরে দৌড়াতে দৌড়াতে জীবন ক্ষয় করে ফেলার পরিবর্তে মাত্র কয়েক ঘণ্টায় একটি নতুন কোম্পানি তৈরি করতে পারবেন।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

রাষ্ট্র নিয়ে আমরা গর্বিত। রাষ্ট্রের কাছে আমরা ন্যায্য অধিকার চাই এবং আমরাও আমাদের দায়িত্বগুলো যথাযথভাবে পালন করবো। তবে এই বিবেচনাবোধের পূর্বশর্ত হচ্ছে – আমরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছি এবং কেউই আইনের দণ্ড থেকে অব্যাহতি পাবে না।

আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই, আননাহদা দুর্নীতি, ঘুষ, কর ফাঁকি এবং জনগণের সম্পদ অপচয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিরোধ মীমাংসার জন্য আমাদের আহ্বানের অর্থ দুর্নীতি আড়াল করা বা একে ন্যায্যতা দেয়া কিংবা দুর্নীতির নতুন কোনো রাস্তা তৈরি করা নয়।

আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ট ব্যবসায়ী এবং গুটিকতক দুর্নীতিবাজ ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য গড়ে তোলা এবং দুর্নীতিবাজদেরকে তাদের অপরাধ স্বীকার, ক্ষমা প্রার্থনা

এবং অবৈধভাবে তারা যা কামিয়েছে তা ফেরত দেওয়ার একটা সুযোগ দেয়া। এই প্রক্রিয়া স্বাধীন অর্থনৈতিক উদ্যোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

সার্বজনীন ঐক্যের আহ্বান

আমরা বারংবার বলে আসছি – আমরা এমন একটি সার্বজনীন জাতীয় ঐক্য, সহযোগিতা ও সংহতি গড়ে তুলতে চাই; যেখানে বিপ্লব ও শহীদ বিপ্লবীদের যথাযথ স্বীকৃতি দেয়া হবে ও সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকবে। ইসলামপন্থী, দস্তুরিয়াপন্থী[১], বামপন্থীসহ বিপ্লবকে মূল্যায়ন করে এমন সকল বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক ধারার জন্যই একটি অংশীদারিত্বমূলক অবস্থান গড়ে তোলার সুযোগ তৈরি হয়েছে। তাই আমরা চাইলে সবাই মিলে ঘৃণা ও বর্জনের সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে এসে একটি ভবিষ্যত গড়ে তুলতে পারি।

এটা কোনো 'গোপন সমঝোতা' নয়। বরং এটি হচ্ছে রাষ্ট্র বনাম নাগরিক, রাষ্ট্রের সুবিধাপ্রাপ্ত বনাম বঞ্চিত অঞ্চল, বিপরীতমুখী দুই রাজনৈতিক পক্ষ এবং অতীত বনাম বর্তমানের মধ্যে বিরোধ মিটিয়ে ফেলার জাতীয় আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ। আননাহদা বিভাজনের পরিবর্তে ঐক্য প্রক্রিয়ার পক্ষের শক্তি।

কার্যকর সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচি

মিডিয়ায় রাজনীতিবিদদের বিতর্ক শুনতে শুনতে জনগণ ত্যক্তবিরক্ত। নিরাপত্তা, সন্ত্রাসবাদ, জীবনযাত্রার ব্যয়, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দরিদ্র, বঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সংগ্রাম তাদের কাছে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। আননাহদার সদস্য ও সমর্থকবৃন্দ, আপনাদেরকে অবশ্যই উচ্চমার্গীয় আদর্শগত বিষয়ে তর্ক করার পরিবর্তে নাগরিকদের কাছে বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে সচেতন হতে হবে। নিছক আদর্শ, বড় বড় শ্লোগান ও রাজনৈতিক ঝগড়া-বিবাদ দিয়ে কোনো আধুনিক রাষ্ট্র চলতে পারে না। সবার জন্য নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার মতো সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচি ও সেসবের বাস্তবায়নের মাধ্যমেই রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। অতীত আদর্শনির্ভর তাত্ত্বিক অবস্থান হতে আননাহদা নিজেকে সরিয়ে এনে গণতান্ত্রিক

[১] ২০১১ সালে বিপ্লবের পর স্বৈরশাসক বেন আলীর দল 'ডেমোক্রেটিক কনস্টিটিউশনাল র‍্যালী' বিলুপ্ত হয়ে যায়। দলটি আরবীতে 'আত-তাজাম্মুয়ু দস্তুরিয়্যু দেমোক্রাতিয়্যু' নামে পরিচিত ছিল। 'দস্তুর' শব্দের অর্থ সংবিধান। বিলুপ্ত দলটির নেতৃবৃন্দ বিপ্লবের পর 'দস্তুরিয়ান মুভমেন্ট' নামে নতুন দল গড়ে তোলেন। দলটির নেতাকর্মীরা 'দস্তুরিয়ান' তথা দস্তুরিয়াপন্থী হিসেবে পরিচিত।

উত্তরণ নিশ্চিতকরণকে লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। অর্থনৈতিক উন্নতি এখন এর প্রাথমিক ফোকাস।

নারী অধিকার

শহর-গ্রাম, দেশ-বিদেশ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-কর্মক্ষেত্র এবং ঘরে-বাইরের সকল তিউনিশিয়ান নারীদেরকে আমি অভিবাদন জানাই। তিউনিশিয়ান নারীদের অধিকার ও উন্নতিতে আমরা গর্বিত। তাদের সম্ভাবনার বিকাশ এবং আরো বেশি স্বাধীনতা প্রদানের পক্ষে আমাদের সমর্থন অব্যাহত থাকবে। একইসাথে ঐক্য ও সংহতির ভিত্তি হিসেবে সামাজিক কাঠামো ও পরিবার প্রথার সংরক্ষণকেও আমরা সমর্থন করি।

শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার

শিক্ষা হচ্ছে তিউনিশিয়ানদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। জ্ঞান ও নৈতিকতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা এবং কর্মসংস্থান উপযোগী শিক্ষার নিশ্চয়তার লক্ষ্যে শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের জাতীয় আকাঙ্ক্ষার সাথে একমত পোষণ করাকে আমরা জরুরি মনে করছি। মাদক ও সহিংসতাসহ তরুণদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়গুলো আমাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে। সন্ত্রাসবাদের দুষ্ট চক্রের ফাঁদে পড়ে তারা যেসব উপায়ে ব্যবহৃত হচ্ছে, সেগুলোও চিহ্নিত করতে হবে। শিক্ষা কীভাবে একজনকে চাকরির বাজার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, তাও আমাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে।

জোড়াতালি মার্কা সংস্কারের সংস্কৃতি থেকে আমাদেরকে অবশ্যই বেরিয়ে আসতে হবে। একইসাথে গুণগত মানের পরিবর্তে সংখ্যাধিক্যকে প্রাধান্য দেয়ার প্রবণতা থেকেও বেরিয়ে আসতে হবে। বেকারত্বের রাস্তা নয়, শিক্ষাকে হতে হবে কর্মসংস্থানের প্রবেশ দ্বার – এই ধারণার উপর আমাদেরকে জোর দিতে হবে।

সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ

সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটানো ছাড়া কোনো উন্নয়নই টেকসই হতে পারে না। তাই দেশের সর্বত্র, বিশেষ করে প্রান্তিক অঞ্চল ও ঘনবসতিপূর্ণ শহরতলীতে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রচলন ঘটাতে হবে। প্রতিটি ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে আমরা একটি সুইমিং পুল, একটি ক্রীড়া কেন্দ্র এবং একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র দেখতে চাই।

বেকারত্ব দূরীকরণ

ভোকেশনাল ট্রেনিং সিস্টেমকে শক্তিশালীকরণ, একে প্রমোট করা এবং এর গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করা নিঃসন্দেহে আমাদের সংস্কার পরিকল্পনার অংশ।

নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আঞ্চলিক উন্নয়নের ভারসাম্যতা অর্জন, কর্ম-উদ্যোগের উপর গুরুত্বারোপ এবং ব্যক্তি-উদ্যোগে উৎসাহ প্রদানের মতো বিনিয়োগনির্ভর অর্থনৈতিক মডেলই বেকারত্ব দূর করতে পারে।

আঞ্চলিক উন্নয়ন

দেশের বঞ্চিত অঞ্চলের উন্নতির জন্য সংবিধানে যে 'গঠনমূলক বৈষম্যের নীতি' সংরক্ষিত আছে, আমরা তা বাস্তবায়ন করার উপর গুরুত্বারোপ করছি। আসন্ন স্থানীয় নির্বাচনের মাধ্যমে বিকেন্দ্রীকরণের যে প্রক্রিয়া শুরু হবে, আমরা তা সমর্থন করি এবং একে স্বাগত জানাই। দেশের অঞ্চলগুলোর স্ব স্ব প্রাকৃতিক সম্পদের অনুপাত অনুসারে আঞ্চলিক উন্নয়নের নীতিকে আমরা সমর্থন করি।

আগামী পাঁচ বছরে প্রতিটি জেলার নিজস্ব অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে একটি করে বৃহৎ অর্থনৈতিক প্রকল্প বাস্তবায়ন জরুরি। তরুণ উদ্যোক্তাদের মধ্যে জাতীয় ভূমি বণ্টন শুরু করা, বিনিয়োগ ও উদ্যোগের উপর প্রশাসনিক ও আইনি নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা দূর করা দরকার। এ জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক মন্ত্রণালয়ের অধীনে সরকারের কাজ করা প্রয়োজন।

সমাজকল্যাণ

সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম ছড়িয়ে দেয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়াও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। বিশেষ করে কৃষি শ্রমিকদের জন্য এটা বেশি দরকার। তাদেরকে প্রয়োজনীয় ভর্তুকি দেয়া জরুরি। কাজ করার সামাজিক অভ্যাস তৈরি করতে হবে। প্রত্যেকের যেমন নির্দিষ্ট অধিকার রয়েছে, তেমনি নিজস্ব দায়দায়িত্ব পালনের বাধ্যবাধকতাও রয়েছে।

গণতন্ত্রের গুরুত্ব

দ্বন্দ্ব-সংঘাত সমাধানের পথ হলো ঐক্যমত্য গড়ে তোলা এবং সহাবস্থানের ভিত্তি স্থাপন করা। এটা এখন প্রমাণিত। এ সংক্রান্ত তিউনিশিয়ার সাম্প্রতিক ভূমিকা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি অর্জন করেছে। আমরা এ জন্য গর্বিত। আরব বিশ্বে যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, তিউনিশিয়া প্রমাণ করেছে। দুর্নীতি, ঘুষ, স্বৈরতন্ত্র, বিশৃঙ্খলা ও সন্ত্রাসবাদ থেকে মুক্তির সমাধান যে গণতন্ত্র, আমরা তা দেখাতে পেরেছি। পশ্চাৎপদ একনায়কতন্ত্রকে সমর্থন করার চেয়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা অপেক্ষাকৃত ভালো ও অধিক ফলপ্রসু।

ধনী ও গরিব, উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চল, সংস্কৃতি ও সভ্যতা এবং বিভিন্ন বিশ্বাসের বিরোধ মীমাংসা করার মধ্যেই সমাধান নিহিত রয়েছে। বর্তমান দুনিয়ার জন্য দরকার পারস্পরিক বোঝাপড়া, শান্তি, সংহতি, নিরাপত্তা ও সহিষ্ণুতা।

আত্মসমালোচনা

অসংখ্য ত্যাগ, অশ্রু ও রক্তের বিনিময়ে আননাহদার সদস্যরা শেষ পর্যন্ত ধৈর্য্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। এর মাধ্যমে তারা আমাদেরকে নিজেদের ভুলগুলো স্বীকার করা এবং আত্মম্ভরিতা থেকে বেরিয়ে এসে নিজেদের পলিসির পুনর্মূল্যায়ন করার সাহস অর্জন করতে শিখিয়েছে।

বর্তমান যুগে এগিয়ে যাবার অন্যতম পূর্বশর্ত হলো আত্মসমালোচনা করা। আমাদের ঐহিত্য অনুযায়ী আমরা সাধারণত তা করে থাকি। এবারের দশম সম্মেলনে আমরা একে আরো সংহত করবো। কারণ, আমাদের কাছে জনগণের প্রত্যাশা অনেক বেশি।

ঐক্যবদ্ধ নয়া আননাহদা

এই সম্মেলনের প্রাথমিক সফলতা হচ্ছে এক নতুন ও ঐক্যবদ্ধ আননাহদাকে জনগণের কাছে উপস্থাপন করা। এই আননাহদা তিউনিশিয়ার সমস্যাগুলো সমাধানে কাজ করতে সক্ষম। এই দল জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার দল। এই দলটি জাতীয় উদ্দেশ্য মূল্যায়ন ও গঠনমূলক সমালোচনা করতে সক্ষম, যা দেশে বিকল্প গণতান্ত্রিক শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক। দলটির অভ্যন্তরীণ পরিবেশ স্বচ্ছতার নীতি দ্বারা পরিচালিত। এর সকল সামর্থ্য ও সম্ভাবনা সবার জন্য উন্মুক্ত। দলটি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তার সকল সদস্যের জন্য গর্বিত।

মেজরিটি-মাইনরিটির ভিত্তিতে নয়, বরং ঐক্যমত্য ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতেই আসন্ন বছরগুলোতে তিউনিশিয়া শাসন করতে হবে।

তিউনিশিয়ার স্বপ্ন

আমি তিউনিশিয়ায় দীর্ঘদিনের জন্য নিষিদ্ধ ছিলাম। বিশ্বের যে কোনো এয়ারপোর্টে যখনই আমি তিউনিশ এয়ারের কোনো বিমান দেখতাম, তখনই আমি দেশে ফেরার স্বপ্নে বিভোর হতাম। এমন স্বপ্ন, যা ছিল বাস্তবতা থেকে বহু দূরে!

আমি কি কোনোদিন বাড়ি ফিরতে পারবো?

আমি কি আর একটা বার আমাদের পুত্র-কন্যাদের সাথে দেখা করতে পারবো, যারা অসংখ্য কারাগার ও নির্বাসনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে?

আমার দেশের রাস্তায় হাঁটাচলা করার অধিকার কি আমার আর কোনোদিন হবে? ঈদ-উৎসবে পরিবার, বন্ধুবান্ধব, সহকর্মীদেরকে শুভেচ্ছা জানানোর সুযোগ কি আর হবে?

আল্লাহর রহমতে সেই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয়েছে। সেই স্বপ্ন এখন দিক পরিবর্তন করে তিউনিশিয়ার জন্য একটি নতুন আগামী তৈরির স্বপ্নের দিকে বাঁক নিয়েছে। স্বপ্নটা আমার ভেতরে ক্রমাগত বেড়েই চলছে।

একটি সুন্দর ও ঐক্যবদ্ধ তিউনিশিয়া গড়ার স্বপ্ন! একটি গণতান্ত্রিক, উন্নত ও সমন্বিত তিউনিশিয়া গড়ার স্বপ্ন!

আমাদেরকে অবশ্যই দেশবাসীর সাথে এই স্বপ্ন ভাগ করে নিতে হবে। সেইসাথে অতীতকে পেছনে ফেলে ভবিষ্যতের উপর ভরসা করে আমাদেরকে আশাবাদী ও সংকল্পবদ্ধ হতে হবে।

এটাই হচ্ছে তিউনিশিয়ার স্বপ্ন। বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য এই স্বপ্ন আমাদেরকে কঠোর পরিশ্রম ও ত্যাগস্বীকার করতে অনুপ্রাণিত করে।

সকল প্রকার জটিলতা নিরসন ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আপনারা, তিউনিশিয়ান নারী-পুরুষেরা, অনেক বেশি শক্তিশালী।

যাত্রা শুরু করার জন্য তিউনিশয়ান জাহাজের এখনই সময়; যে যাত্রা হবে উন্নয়ন ও অগ্রগতির; ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের নয়, সব মানুষের।

আল্লাহর রহমতের উপর ভরসা করে আমরা এই সম্মেলনের উদ্বোধন করছি। আমাদের দেশ ও আমাদের সকলের ভবিষ্যতের জন্য যা সবচেয়ে ভালো, আমরা যেন তা-ই বাছাই করতে পারি। আল্লাহর কাছে সেই তওফিক কামনা করছি।

অনুবাদ: মাসউদুল আলম

আন নাহদা কি ইসলামপন্থী, নাকি মুসলিম ডেমোক্র্যাট?

সাইয়েদা ওয়ানিসি

[ব্রুকিংস ইনস্টিটিউশনের দোহা সেন্টার কর্তৃক 'Rethinking Political Islam' শীর্ষক একটি গবেষণা প্রকল্প আরব বসন্তের পর শুরু হয়েছিল। তিউনিশিয়ার আন নাহদাসহ বিশ্বের ১২টি দেশের ইসলামী আন্দোলনকে এই গবেষণার আওতায় আনা হয়। প্রকল্পের প্রথম ধাপে সংশ্লিষ্ট গবেষকগণ প্রতিটি দেশের আন্দোলনের জন্য একটি করে ওয়ার্কিং পেপার তৈরি করেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে গবেষকরা উক্ত প্রবন্ধসমূহের উপর পর্যালোচনামূলক নিবন্ধ লেখেন। এরই ধারাবাহিকতায় 'Islamists on Islamism Today' শিরোনামে একটি নতুন সিরিজ চালু করা হয়। এ পর্যায়ে ইসলামপন্থী এক্টিভিস্ট ও নেতৃবৃন্দ প্রকল্প গবেষকদের কাজের ব্যাপারে নিজেদের মত-দ্বিমতগুলো তুলে ধরবেন এবং গঠনমূলক আলোচনার স্বার্থে রাজনৈতিক ইসলামের উপর শীর্ষস্থানীয় গবেষকদের যুক্তি ও অনুমানগুলোকে চ্যালেঞ্জ করবেন। এরইসাথে তাদের আন্দোলনের ব্যাপারে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গিগুলোও তুলে ধরবেন।

এই সিরিজে তিউনিশিয়ার আন নাহদার উপর শীর্ষ বিশেষজ্ঞ, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক মনিকা মার্কসের বক্তব্যের জবাব দেন আন নাহদার সংসদ সদস্য সাইয়েদা ওয়ানিসি। - সম্পাদক]

একাডেমিক গবেষণা ও মিডিয়া– উভয় জায়গাতেই আমাদেরকে কীভাবে চিত্রায়িত করা হয়, আন নাহদার একজন সংসদ সদস্য হিসেবে সে ব্যাপারে আমি বরাবরই আগ্রহী। ইসলামপন্থী একটি দল হিসেবে আমাদের প্রকৃত পরিচয় কী এবং আমাদেরকে কীভাবে বিবেচনা করা হয়– এ দুয়ের মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে বলে আমি মনে করি।

ব্রুকিংসের 'Rethinking Political Islam' প্রকল্পে মনিকা মার্কস[১], আভি স্পিজেল[২] ও স্টিভেন ব্রুক[৩] যেসব ইস্যু তুলে এনেছেন, সেগুলোর কোনো কোনোটি নিয়ে আমি একটা স্পষ্ট ধারণা দিতে চেষ্টা করবো। প্রথমে আমি আন নাহদার আদর্শ নিয়ে বলবো। আমাদের আন্দোলনের সাথে সাধারণত মুসলিম ব্রাদারহুডের সম্পর্ক রয়েছে বলে বলা হয়ে থাকে। তাই প্রসঙ্গটি বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে। দ্বিতীয়ত, মিশরের মুসলিম ব্রাদারহুডের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে 'লিগালিস্ট অ্যাপ্রোচে'র[৪] ব্যর্থতা কী ছিল এবং বাদবাকি আরব বিশ্বে এর পরিণতি কী হয়েছিল, তার উপর আমি আলোকপাত করবো। তিউনিশিয়ার গণতান্ত্রিক উত্তরণ প্রক্রিয়ায় ২০১৩ সালের ৩ জুলাই মিশরে সংঘটিত ক্যুর প্রভাব আসলে কতটুকু ছিল, সেই বাস্তবতাও এই সুযোগে তুলে ধরবো। সর্বশেষ, আমাদের উপর যে ধরনের পরিচয় আরোপ করা হয়, তা পুনর্বিবেচনা করতে অনুরোধ করবো। গতানুগতিক 'ইসলাপন্থী' পরিচয়ের পরিবর্তে 'মুসলিম ডেমোক্র্যাট' পরিচয় সম্ভবত আন নাহদার জন্য অধিকতর সঠিক।

আন নাহদা কি তিউনিশিয়ান মুসলিম ব্রাদারহুড, নাকি বরগিবার 'অবৈধ সন্তান'?

ইসলামী মূল্যবোধভিত্তিক সমসাময়িক সকল রাজনৈতিক দলকে মুসলিম ব্রাদারহুডের সাথে সংযুক্ত করার একটা গতানুগতিক প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। যেন ব্রাদারহুড এক ধরনের 'প্যারেন্ট কোম্পানি'। এই দৃষ্টিভঙ্গি যে বাস্তবসম্মত নয়, তা স্বীকার করে নেয়ার সময় হয়েছে বলে আমি মনে করি। বিশেষ করে, এসব দলের গৃহীত সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তগুলোর আলোকে এমনটা বলাই যায়। আন নাহদার প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে রশিদ ঘানুশী কর্তৃক হাসান আল বান্নার মতাদর্শ তিউনিশিয়ায় আমদানী করার চেয়েও অনেক বেশি জটিল পরিস্থিতি এখানে ছিল। ইসলামিক টেনডেন্সি মুভমেন্টের

---

[১] Monica Marks, "Tunisia's Ennahda: Rethinking Islamism in the context of ISIS and the Egyptian coup," Brookings Institution, August 2015.

[২] Avi Spiegel, "Succeeding by surviving: Examining the durability of political Islam in Morocco," Brookings Institution, August 2015.

[৩] Steven Brooke, "The Muslim Brotherhood's Social Outreach after the Egyptian Coup," Brookings Institution, August 2015.

[৪] ইসলামী শরীয়াহর বিধিবিধান বাস্তবায়ন করার জন্য যারা অধিকতর আগ্রহী এবং এসব বিধিবিধান প্রতিপালিত হওয়ার ভিত্তিতে কোনো সমাজে ইসলাম কতটুকু প্রতিষ্ঠিত আছে, তা পরিমাপ করায় যারা আগ্রহী– ইসলাম সম্পর্কে কারো এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিকে আমরা লিগালিস্ট অ্যাপ্রোচ বলতে পারি। – অনুবাদক

(যা পরবর্তীতে আন নাহদা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে) প্রতিষ্ঠাতাবৃন্দ তিউনিশিয়ার জাতীয় ইস্যুগুলোতে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিউনিশিয়ার ইসলামী আন্দোলন যে স্থানীয় নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, এখান থেকেই তা বুঝা যায়।

তিউনিশিয়ার ইসলামী আন্দোলনের বুদ্ধিবৃত্তিক ও ধর্মীয় পটভূমি কী ছিল, তা অনেকভাবেই যাচাই করা যেতে পারে। যেমন, আন নাহদার প্রধান দুই প্রতিষ্ঠাতাই (আবদেল ফাত্তাহ মুরু এবং রশিদ ঘানুশী) ছিলেন জায়তুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট। ৭৩৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি আরব বিশ্বের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়। সামাজিক বাস্তবতার দিকে লক্ষ রাখার ব্যাপারে এর অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। আবদেল ফাত্তাহ মুরু'র আধ্যাত্মিক গুরু শায়খ আহমেদ বেন মিলাদ ছিলেন জায়তুনিয়ান। অথচ কারো কারো ভুল অনুমান হলো, মুরু হলেন সাইয়েদ কুতুবের অনুসারী। এই ব্যাপারটি বুঝতে পারা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। তিউনিশিয়ার জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে বেন মিলাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। আধুনিক তিউনিশীয় রাষ্ট্র গঠন এবং এর রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করার জন্য তিনি প্রচণ্ড সংগ্রাম করেছেন। বরগিবার শাসনামলে সংসদ অধিবেশন চলা অবস্থায় সংসদ ভবনের সামনে জায়তুনার একদল স্কলারকে সাথে নিয়ে তোলা মিলাদের একটি ছবি খুব বিখ্যাত।

যাইহোক, শুরুর বছরগুলোতে আন নাহদার ধর্মীয় সার্কেল ছিল শায়খ তাহের বেন আশুরের শিক্ষা ও আইনী মতামত দ্বারা প্রভাবিত। বেন আশুর ছিলেন জায়তুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ও মালেকী মাজহাবের সমর্থক। কোরআনের যৌক্তিক উপস্থাপনা সমৃদ্ধ তাফসীর রচনায় তিনি ছিলেন অন্যতম পথিকৃৎ। মাকাসিদে শরীয়াহর (শরীয়াহর উদ্দেশ্য ও মূলনীতি) গুরুত্বের উপর তিনি জোর দিয়েছেন। অর্থাৎ, তিনি মনে করতেন, ইসলামী আইনের বাহ্যিক কাঠামেরার চেয়ে এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যই হলো অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর এই অবস্থান রক্ষণশীলদের বিরুদ্ধে যাওয়ায় ১৯৬০ সালে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জোরপূর্বক বের করে দেয়া হয়।

রশিদ ঘানুশীসহ আন নাহদার নেতৃবৃন্দের অনেকে রক্ষণশীলদের বিপরীতে আরেক 'বিতর্কিত' স্কলার তাহের হাদ্দাদের চিন্তাধারাকে প্রতিষ্ঠিত করতেও কাজ করেছেন। 'শরীয়াহ ও সমাজের দৃষ্টিতে নারী' শিরোনামের এক বইয়ে হাদ্দাদ জায়তুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আলেমদের অতি রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। ট্রেড ইউনিয়ন ও সমাজকল্যাণমূলক কাজকর্মের দিক থেকে তিনি রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন।

এই ব্যক্তিগণ স্পষ্টতই পবিত্র ধর্মগ্রন্থের শিক্ষার আলোকে তিউনিশিয়ার জন্য একটি প্রগতিশীল ও যৌক্তিক ধারা গড়ে তোলার জন্য কাজ করেছেন। রাষ্ট্রীয় আইন,

বিশেষত, সামাজিক ও ব্যক্তিগত আইনগুলোর আধুনিকায়ন করার ক্ষেত্রে হাবিব বরগিবার জন্য তারা সহায়ক ভূমিকা পালন করেন।

ইসলামী দলগুলোর অভ্যন্তরীণ বিতর্ক ও ভাবনা আদান-প্রদানের ক্ষেত্র হিসেবে যে সব আন্তর্জাতিক ফোরাম রয়েছে কিংবা হাসান আল বান্নার মতো চিন্তাবিদদের চিন্তাধারার যে ধরন – সে সবের প্রভাবকে অস্বীকার করা এখানে আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু এইসব বাহ্যিক ফ্যাক্টরগুলোর প্রভাব যে মাত্রায় রয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন, সে ধরনের কোনো প্রভাব আসলে আন নাহদার উপর নেই। উল্লেখ্য, বুদ্ধিবৃত্তিক স্তরে এসব ফ্যাক্টর নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ। মিশরের মুসলিম ব্রাদারহুডের সাহিত্য আন নাহদার চিন্তার মৌলিক খোরাক জুগিয়েছে, এটা সত্য। তবে পরবর্তীতে স্থানীয় আদর্শিক পরিবেশ, তিউনিশিয়ার একান্ত নিজস্ব পরিস্থিতি ইত্যাদির আলোকে এসব সাহিত্যের নতুন ব্যাখ্যা এখানে দাঁড় করানো হয়েছে।

আমার বিশ্বাস, ইসলামী আন্দোলনগুলোর মধ্যে যারা তাদের প্রাথমিক প্রস্তাবনাকে আঁকড়ে ধরে রাখার চেয়ে বাস্তব রাজনৈতিক ময়দানে আরো বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখতে চায়, তাদের জন্য 'গ্র্যান্ড সুওর'[৫] (Grand Soir) হচ্ছে একদম নতুন একটি ধারণা। কেউ বলতেই পারেন, আন নাহদার প্রতিষ্ঠাকালীন প্রজন্ম ছিল বরগিবার 'অবৈধ সন্তান'। কেউ হয়ত আরেক ধাপ এগিয়ে আরো বলতে পারেন – তারা জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে সামাজিক পুনর্জাগরণ এবং আধুনিক সরকার ব্যবস্থার অপরিহার্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছেন।

'Tunisia's Ennahda: Rethinking Islamism in the context of ISIS and the Egyptian coup' শীর্ষক ওয়ার্কিং পেপারে মনিকা মার্কসও বলেছেন, মুসলিম ব্রাদারহুডের আদর্শিক ও রাজনৈতিক উভয় অবস্থান থেকেই আন নাহদার সদস্যরা নিজেদেরকে স্বতন্ত্র মনে করে।[৬] তারপরেও ২০১১ সালের বিপ্লবের পর থেকে এখন পর্যন্ত বিশ্লেষকরা আন নাহদাকে মুসলিম ব্রাদারহুডের একটি তিউনিশীয় শাখা হিসেবে বিবেচনা করছেন। ২০১১ সালে প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই দলটির পরিচয় নিয়ে এই জাতীয় অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে। উপরন্তু, কয়েক দশক গোপন তৎপরতা আন নাহদার নিজস্ব ভাবমূর্তি ও রাজনৈতিক ধ্যানধারণার উপর যে প্রভাব ফেলেছিল,

---

[৫] 'গ্রান্ড সুওর' এর উৎপত্তিগত অর্থ হলো সাম্যবাদী ও উদ্দেশ্যবাদী (teleological) মতের সমন্বয়ে একটি সামাজিক অভ্যুত্থান, যা প্রাথমিকভাবে পুঁজিবাদকে উৎখাত করে এবং একইসাথে নতুন একটি ব্যবস্থা সমাজে কায়েম করে। – অনুবাদক

[৬] Monica Marks, "Tunisia's Ennahda: Rethinking Islamism in the context of ISIS and the Egyptian coup," Brookings Institution, August 2015.

তারচেয়ে গত চার বছরের পরীক্ষামূলক সরকার পরিচালনা, অর্থাৎ প্রকৃত রাজনৈতিক তৎপরতার প্রভাব আন নাহদার উপর আরো বেশি পড়েছে।

রাষ্ট্র পরিচালনা করতে গিয়ে আন নাহদার উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গির যে উন্নয়ন ঘটেছে, তার ফলে একটি আইনী সত্তা হিসেবে দলটির অবস্থান মজবুত হয়েছে। তদুপরী, অন্যতম গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে দলটি পাবলিক পলিসি তৈরি ও সেসব বাস্তবায়নে সক্ষমতা অর্জন করেছে। আন নাহদার যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, বাইরে থেকে একে অলীক ও অবিশ্বাস্য ব্যাপার বলে মনে হতে পারে; ইসলামপন্থী বা অন্যান্য অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে যেমনটা সাধারণত হয়ে থাকে। অবশ্যই এই পরিবর্তন একটি অপরিহার্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। ২০১১ সালে বৈধতাপ্রাপ্তি এবং দুটি সেকুলার দলের কোয়ালিশনে প্রথমবারের মতো একটি সরকারের নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আন নাহদার এই অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন প্রক্রিয়া সূচিত হয়।

ইসলামপন্থী অনেক রাজনৈতিক দলই (এক্ষেত্রে মরক্কোর জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টির (পিজেডি) কথা বলা যেতে পারে) নতুন ধরনের তৎপরতা ও কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছে। এ জাতীয় রাজনৈতিক পুনর্গঠনের মাধ্যমে তারা এক ধরনের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তুলে ধরতে চায়। এ ভিশন বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার মাঝখানে সম্ভাব্য প্রতিবিপ্লব মোকাবেলা করার জন্য তারা সতর্ক।

২০১৫ সালের জুন মাসে ব্রুকিংস কর্তৃক দোহায় অনুষ্ঠিত ইউএস-ইসলামিক ওয়ার্ল্ড ফোরামে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ হয়েছিল। মধ্যপ্রাচ্যের (মিশর, মরক্কো, তুরস্ক, সৌদি আরব, কুয়েত ও জর্ডান) বিভিন্ন দেশের ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের তরুণ ইসলামপন্থী এক্টিভিস্টদের সাথে আমরা আলাপ-আলোচনা করেছিলাম।[৭] তাতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে, প্রতিটি দেশেরই স্থানীয় প্রেক্ষাপট ও নিজস্ব পরিকল্পনা রয়েছে। সবসময় বাইরের উদাহরণ খুঁজে না বেড়ানো সত্বেও বিভিন্ন ধরনের জটিলতা ও সমস্যা মোকাবেলায় অন্যদের মডেলও শিক্ষণীয় ও প্রেরণাদায়ক। যেমন, তুরস্কের একেপি ও মরক্কোর পিজেডি'র কাছ থেকে আন নাহদা রাষ্ট্রের সফল অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে।

এই দল দুটির বাস্তবমুখিতার ব্যাপারে বিশ্লেষকরা বিস্ময় প্রকাশ করলে আমি খুব অবাক হই। এই দলগুলোর আচরণ অন্তর্মুখী এবং সেকেলে ধর্মীয় ভাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ –

[৭] "The Arab uprisings and the next generation of Islamists," Brookings Institution, June 2015.

বিশ্লেষকদের কথাবার্তায় এমন মনোভাব লক্ষ করা যায়। পাবলিক পলিসি তৈরিতে এই দলগুলোর অংশগ্রহণ ও রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত সকল তৎপরতা প্রকাশ্য থাকার পরও তারা এমনটা মনে করেন। উদারহণ হিসেবে আন নাহদার 'তাজকিয়া' (এর মাধ্যমে দলের কোনো সদস্য সম্ভাব্য প্রার্থী হওয়ার ব্যাপারে 'শপথ' গ্রহণ করেন) প্রক্রিয়ার কথা বলা যায়। এটি কমবেশি একটি সহজ ও শর্তহীন অনুমোদন প্রক্রিয়ায় রূপ নিয়েছে। দল (হিজব) এবং আন্দোলনের (হারাকা) মধ্যকার চলমান বিভাজন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে এ ধরনের আরো ব্যবস্থাপনামূলক কর্মপদ্ধতির আধুনিকায়ন করা হয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যের, বিশেষত তিউনিশিয়ার মতো পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাওয়া দেশগুলোর রাজনৈতিক দলের পেশাদারিত্বের দিকে আরো গভীর দৃষ্টি দেয়ার সময় এসেছে। রাষ্ট্রের চরিত্র, সামাজিক কাজ এবং ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যকার সম্পর্ক (শরীয়াহকে মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণের বিষয়টিসহ) সংক্রান্ত বিতর্কগুলো আন নাহদা বিবেচনায় নিয়েছে। ২০১১ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত গঠনতন্ত্র প্রণয়ন প্রক্রিয়া চলার সময় আমরা এগুলোর সমাধান করেছি। এর ফলে যে গঠনতন্ত্র প্রণীত হয়েছে, তা নিয়ে তিউনিশীয়রা খুবই গর্বিত। এটি এমনভাবে প্রণয়ণ করা হয়েছে, যার ফলে নিকট ভবিষ্যতে এতে বড় ধরনের কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। বিদ্যমান সকল ডকুমেন্ট নিয়ে টানা চার বছর ধারাবাহিক আলোচনার মাধ্যমে এটি চূড়ান্ত করা হয়েছে।

তারপরও যেসব রাজনৈতিক দল ২০১৪ সালের সংসদীয় নির্বাচনী প্রচারণার সময় সংবিধানের বিভিন্ন ত্রুটিবিচ্যুতি নিয়ে প্রচারণা চালাচ্ছিল, সেগুলোর সমাধানও করা হয়েছে। এমনকি কট্টর বামপন্থী দল 'পপুলার ফ্রন্টে'র প্রার্থী হাম্মা হাম্মামি পর্যন্ত এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন না করা সত্ত্বেও ভোটারদেরকে আশ্বস্ত করা দরকার মনে করেছেন। তিনি নিজেকে একজন মুসলমান এবং নবী মোহাম্মদকে (সা) ভালোবাসেন বলে দাবি করেছেন। এমনকি নিদা তিউনিসের মতো সেকুলার ও ইসলামপন্থা বিরোধী হিসেবে পরিচিত দলও সংসদ ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রচারণার সময় ধর্মীয় সেন্টিমেন্টকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগিয়েছে। আমার মনে আছে, 'ফ্রান্স ২৪' চ্যানেলে এক অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ আসার পর নিদা তিউনিসের একজন তরুণ সদস্য আমাকে বলেছিল – ফ্রান্সের সাংবাদিকদের উচিত তাদেরকে 'laique' (ধর্ম থেকে রাজনীতির পৃথকীকরণের সমর্থক) বলা বন্ধ করা।

কারণ তারা তেমনটি নয় এবং তিউনিশিয়ানদের কাছে নিছক এই পরিচয়ে পরিচিত হতে চায় না।[৮]

জনগণের কাছে আন নাহদা যে ধরনের ইস্যুগুলোকে তুলে ধরেছে, তা থেকে এ জাতীয় দলগুলোর বিচক্ষণতা প্রতীয়মান হয়। ইসলাম ও রাষ্ট্রের মধ্যকার সম্পর্কের সাথে এর কোনো প্রকার সম্পর্ক নেই। কিংবা গতানুগতিক 'ইসলামী' ইস্যুর সাথেও এর সম্পর্ক নেই। বরং দুর্নীতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক সমস্যা ও মানবাধিকারের মতো ইস্যুগুলোর সমাধান করতেই আন নাহদা বদ্ধপরিকর।

'লিগ্যাল অ্যাপ্রোচে'র ব্যর্থতা এবং তিউনিশিয়ায় মিশরীয় ক্যু'র প্রভাব

রাজনৈতিক ব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠান ও অগ্রাধিকার বিবেচনায় না নিয়ে মিশরের মুসলিম ব্রাদারহুড যে ধরনের 'লিগ্যাল অ্যাপ্রোচ' মানুষের কাছে তুলে ধরেছিল, তার ব্যর্থতা আরব বিশ্বের তরুণ প্রজন্মকে প্রচণ্ড নাড়া দিয়েছে। সেখানকার ইসলামপন্থীরা নিয়মতান্ত্রিকভাবে চেষ্টা করার পরও তাদেরকে কখনো গ্রহণযোগ্য মনে করা হবে না। ব্যালট বাক্সের রায়ও সেখানে চ্যালেঞ্জের মুখে। নির্বাচন সেখানে ক্ষমতায় যাওয়ার আসল উপায় নয়। উপরন্তু, ইসলামপন্থীদের উপর সেনাবাহিনীর অকথ্য নির্যাতনের ফলে তারা রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, মিশরে নিছক একটি সেনা অভ্যুত্থানই ঘটেনি, রাষ্ট্রের সাথে পুরো প্রজন্মের বিরোধ মিটিয়ে ফেলার যে সুযোগ তৈরি হয়েছিল, তা নষ্ট করা হয়েছে।

তরুণ প্রজন্মের সহিংস প্রতিক্রিয়া দেখানোর ঝুঁকি রয়েই গেছে, যদিও তা শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসু হবে না। অবশ্য ব্রাদারহুডপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলো সেনা অভ্যুত্থানের পর থেকে এখন পর্যন্ত সেনাবাহিনীর নির্যাতনের বিরুদ্ধে সতর্কতার সাথে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করে যাচ্ছে। সহিংস কর্মকাণ্ডের ফাঁদে তারা পা দেয়নি। এরমানে হচ্ছে, মিশরে ISIS ও অন্যান্য চরমপন্থী গ্রুপগুলোর যে উত্থান ঘটেছে, তার সাথে সেনা অভ্যুত্থান ও ক্রাকডাউনের এক প্রকার সম্পর্ক রয়েছে। সহিংসতা নতুন সহিংসতারই জন্ম দেয়। এই পৈশাচিক চক্রকে স্বৈরতন্ত্র নিজেই লালন করে; সেই স্বৈরতন্ত্র সামরিক বাহিনী, সেকুলার মতাদর্শ কিংবা ইসলাম – যেই নামেই থাকুক না কেন। আরব বিশ্বের দেশগুলোর গণতান্ত্রিক উত্তরণ প্রক্রিয়া, মানবাধিকার ও ব্যক্তি

[৮] "Tunisie : quels sont les défis qui attendent le nouveau pouvoir ? [Tunisia: What are the challenges facing the new government?]," France 24. October 28 2014,

স্বাধীনতা রক্ষায় যথেষ্ট উদ্যোগী না হওয়ায় তথাকথিত 'সার্বজনীন মূল্যবোধে'র বড়াই বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

সচরাচর বলা হয়, মিশরীয় অভ্যুত্থানের ফলেই আন নাহদা একটি টেকনোক্র্যাট সরকারের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে; যে সরকারের প্রধান কাজ ছিল এক বছরের মধ্যে সংসদ ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আয়োজন করা। আন নাহদার এই 'পিছু হটা'র কারণ হিসেবে বলা হয়, মিশরে মুসলিম ব্রাদারহুডের পতনের ফলে আন নাহদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে। আমি মনে করি, এই ধরনের ব্যাখ্যা থেকে মোটেও পরিস্থিতির পুরো চিত্র উঠে আসে না। বরং, এর মাধ্যমে আসলে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়ারই চেষ্টা করা হয়।

প্রথম কথা হলো, ২০১৩ সালের গ্রীষ্মে তিউনিশিয়ায় যে রাজনৈতিক সংকট তৈরি হয়েছিল তা মিশরীয় সেনা অভ্যুত্থানের কারণে নয়; বরং তিউনিশিয়ার শীর্ষস্থানীয় বামপন্থী রাজনীতিবিদ মোহাম্মদ ব্রাহমিকে গুপ্তহত্যার কারণেই শুরু হয়েছিল। ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে আরেক রাজনীতিবিদ শুকরি বেলায়েদকে গুপ্তহত্যার পর যে সংকট তৈরি হয়েছিল, এই ঘটনার পর তা পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। মিশরীয় অভ্যুত্থান সম্ভবত এই সংকটকে আরো ঘনীভূত করেছে এবং সেকুলার বিরোধী পক্ষকে তাদের দাবির পক্ষে জোরালো হতে ভূমিকা রেখেছে। তবে মোহাম্মদ মুরসীকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়ার আগেই তিউনিশিয়ার অভ্যন্তরীণ সংকট শুরু হয়েছিল।

এই ঘটনাকে ভালোভাবে বুঝতে হলে আমাদেরকে ২০১১ সালে শুরু হওয়া গণতান্ত্রিক উত্তরণ প্রক্রিয়ার একদম শুরুতে ফিরে যেতে হবে। ২০১১ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জয়লাভের অব্যবহিত পরের আন নাহদার অবস্থানকে বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। দলটি এককভাবে সরকার পরিচালনা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আদর্শিকভাবে ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও সেকুলার জাতীয়তাবাদী 'কংগ্রেস ফর রিপাবলিক' (সিপিআর) এবং সমাজতন্ত্রী 'আত তাকাতুল'– এর সাথে আন নাহদা ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নিয়েছিল।

আমার মতে, এটি ছিল ২০০৫ সালের ১৮ অক্টোবরে গৃহীত সম্মিলিত সিদ্ধান্তেরই ধারাবাহিকতা। সেদিন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জাইন আল আবেদীন বেন আলীর বিরোধী পক্ষের রাজনৈতিক দলগুলো সম্মিলিতভাবে কিছু মৌলিক বিষয়ে ঐক্যমত্যে পৌঁছার লক্ষ্যে একটি কার্যকর সংলাপ প্রক্রিয়া শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সে সিদ্ধান্তগুলোর সারসংক্ষেপ নিয়ে পরে একটি বইও প্রকাশ করা হয়েছিল। সে বইয়ে রাষ্ট্রের সিভিল চরিত্র, শাসন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য, নাগরিক স্বাধীনতা ও নারী অধিকারের

গুরুত্বসহ আরো কিছু ইস্যুতে গৃহীত সিদ্ধান্তের সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হয়েছে।[৯] অন্য কথায়, ক্ষমতা ভাগাভাগি এবং পারস্পরিক হানাহানির ঊর্ধ্বে ওঠে পারস্পরিক সংলাপকে অগ্রাধিকার দেয়া আন নাহদার নীতিরই অন্তর্ভুক্ত। যা মিশরীয় সেনা অভ্যুত্থান, এমনকি ২০১১ সালের অভ্যুত্থানের আগে থেকেই ছিল।

রশিদ ঘানুশী শুরু থেকেই সবসময় ছোট বড় দলগুলোর রাজনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনা না করে, যথাসম্ভব সবাইকে নিয়ে, গণতান্ত্রিক উত্তরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর যুক্তি ছিল, অগ্রগতির পথকে নিরাপদ রাখার এটাই হচ্ছে সবচেয়ে ভালো উপায়। সকল রাজনৈতিক পক্ষকে আমন্ত্রণ জানানোর এই উদ্যোগ থেকে বুঝা যায়, গণতন্ত্রে উত্তরণের পথে রাজনৈতিক বাধাগুলোকে ন্যূনতম মাত্রায় রাখা আন নাহদা নেতৃবৃন্দের সুস্পষ্ট অঙ্গীকারেরই অংশ। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক উদারতা দেখানো ঘানুশীসহ আন নাহদার অন্যান্য নেতৃবৃন্দের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। পুরানো শাসন ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে দেয়া হবে কি হবে না, ২০১৩ সালে সৃষ্ট এই বিতর্ক থেকে আমরা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি – উত্তরণ প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখতে চাইলে 'বর্জনের নীতি' (exclusion) কোনো সমাধান হতে পারে না। ইরাক ও লিবিয়ায় স্থিতিশীলতা না আসার পেছনেও এ ধরনের শুদ্ধি অভিযানের দায় ছিল। তিউনিশিয়ায় যেন এর পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সে জন্য আন নাহদার সংসদ সদস্যরা প্রস্তাবিত electoral exclusion law– এর বিপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। ঐক্য ও সমাঝোতার পক্ষে আন নাহদার এই আহ্বানে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

সংসদীয় নির্বাচনে আন নাহদার প্রার্থীদের প্রধান হিসেবে আমি জাতীয় ঐক্যের জন্য প্রচারণা চালিয়েছি, কোয়ালিশন সরকারের প্রস্তাবনার পক্ষে কথা বলেছি। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে কার্যকর সংস্কারের স্বার্থে একাধিক রাজনৈতিক শক্তিকে সমর্থন করা গুরুত্বপূর্ণ – ভোটারদেরকে এই ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বোঝাতে অনেক পরিশ্রম ও সময় ব্যয় করতে হয়েছে। একটি ব্যাপক ও নজিরবিহীন রাজনৈতিক ভারসাম্য দিয়ে কী লাভ হবে, তা বুঝানো খুব একটা সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না।

শুরা কাউন্সিলে ব্যাপক তর্ক-বিতর্কের পর আন নাহদা এই অবস্থান গ্রহণ করেছিল। লিবীয় বিপ্লবীদের নেতিবাচক পদক্ষেপ, ইরাকের অবনতিশীল অবস্থা এবং সিরিয়ার গৃহযুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে অধিকাংশ তিউনিশীয় বুঝতে পেরেছে, রাজনৈতিক সংকট

[৯] "Notre voie vers la démocratie [Our path to democracy]," Collectif 18 octobre pour les droits et des libertés en Tunisie [The 18 October Coalition for Rights and Freedoms in Tunisia], June 15, 2010,

মোকাবেলায় শুদ্ধি অভিযান সবসময় কার্যকর নয়। আমরা সে ধরনেরই একটা সংকট মোকাবেলা করছি।

আরেকটা বিষয় মনে রাখা দরকার। সেটা হচ্ছে, 'কন্সিটিটিউয়েন্ট এসেম্বলি'র বিলুপ্তি এবং সংবিধান রচনা সংক্রান্ত আলোচনা থেকে আন নাহদা পুরোপুরি বাদ পড়ে যাওয়ার মারাত্মক ঝুঁকি ছিল। এটি ঘটলে, যে কোনো বিবেচনায়ই, তা হতো পুরো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া লাইনচ্যুত হওয়ার মতো ব্যাপার। যাইহোক, অস্থায়ী টেকনোক্র্যাট সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের আগেই আলী লারায়েদের নেতৃত্বাধীন আন নাহদার সরকার সংবিধান চূড়ান্ত করতে পেরেছিল। এর মাধ্যমে আন নাহদা সাংবিধানিক প্রক্রিয়াকে অক্ষুন্ন রাখতে সক্ষম হয়েছিল। এই অর্জনকে আন নাহদা একটি বিরাট সফলতা হিসেবে বিবেচনা করে। আন নাহদার আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত সিদ্ধান্তসমূহের ক্ষেত্রে মিশরীয় পরিস্থিতি শিক্ষণীয় বাস্তব উদাহরণ হিসেবে ক্রিয়াশীল ছিল।

একবিংশ শতাব্দীতে কোনো রাজনৈতিক দলের 'মুসলিম-ডেমোক্র্যাট' হওয়ার তাৎপর্য

পারস্পরিক মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ইসলামপন্থী হিসেবে পরিচিত নানা ঘরানার রাজনৈতিক পক্ষকে মিডিয়া যাতে তাৎক্ষণিক ও সঠিকভাবে বুঝতে পারে, সেই জন্যে রশিদ ঘানুশীই প্রথম এই পরিভাষাটি ব্যবহার করেন। আন নাহদাকে বুঝার জন্য সবচেয়ে সহজ উপায় হলো একে ইউরোপের খ্রিষ্টান-ডেমোক্র্যাট রাজনৈতিক দলগুলোর মতো বিবেচনা করা। যেমন, জার্মানীর 'ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়নে'র মতো দলগুলো একইসাথে গণতন্ত্রের মূলনীতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে ধারণ করে।

আন নাহদার এই নতুন পরিচয়ে দলটির ভেতর ও বাইরের অনেকেই প্রথমে অবাক হয়েছিল। রাজনৈতিক ময়দানে এই পরিবর্তনের (আদৌ 'পরিবর্তন' হয়ে থাকলে আর কি!) কী প্রভাব পড়বে, তা নিয়ে তারা উৎসুক ছিলেন। বাস্তবতা হলো, মুসলিম বিশ্বে বর্তমানে অত্যন্ত ইতিবাচক হিসেবে বিদ্যমান কোনোকিছুকে গ্রহণ করার জন্য আমরা এমন কোনো পরিভাষা ব্যবহার করতে পারি না, যা যথেষ্ট নেতিবাচক হিসেবে ইতোমধ্যে পরিচিতি পেয়েছে। অধিকাংশ মুসলমান মনে করেন, ISIS এবং অনুরূপ অন্যান্য গোষ্ঠী ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা দিচ্ছে, এর অপব্যবহার করছে। এরা নিজেদের নিষ্ঠুর ও অমানবিক কর্মকাণ্ড এবং বিভিন্ন অঞ্চলে সীমাহীন বর্বর যুদ্ধের পক্ষে ধর্মকে একটি মার্কেটিং টুল হিসেবে ব্যবহার করছে। আমরা বিশ্বাস করি, ISIS-এর মোকাবেলায় আমাদের সত্যিকারের ভূমিকা রয়েছে। সহিংসতা, বর্বরতা, আধুনিক রাষ্ট্র, নাগরিক স্বাধীনতা ও শরীয়াহর মূল উদ্দেশ্য (মাকাসিদ আশ-শরীয়াহ) – এই ইস্যুগুলোকে ধর্মীয় ব্যাখ্যার প্রামাণ্য ও স্বীকৃত উৎসগুলোর আলোকে আন নাহদার সদস্যদের মধ্যকার আলেমগণ যাচাই করেছেন।

সহিংস এবং বিপজ্জনক আদর্শের অনুসারী যে কোনো দল থেকে আমরা দূরত্ব বজায় রেখে চলি। আসলে আমরা এর বিরুদ্ধেই লড়ছি। তাই এদের সাথে আমাদের সংশ্লিষ্টতার ব্যাপারে খুব বেশি কথা বলা আমাদের জন্য সময় ও শক্তির অপচয় মাত্র। দেখুন, ফরাসী সমাজতন্ত্রী প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া ওলাঁদকে কেউই প্রকৃতপক্ষে জর্জ সিপ্রিয়ানির সাথে যুক্ত করে না। যদিও সিপ্রিয়ানি ছিলেন সন্ত্রাসী গোষ্ঠী 'অ্যাকশন ডিরেক্টে'র নেতা। এই দুই নেতাই এমন সব রাজনৈতিক গ্রুপ থেকে উঠে এসেছেন, যারা একই মতাদর্শ থেকে অনুপ্রাণিত বলে দাবি করে। অথচ ISIS ও অন্যান্য চরমপন্থীদের সাথে আমাদের পার্থক্য সবার কাছে পরিষ্কার থাকা সত্ত্বেও দুঃখজনকভাবে আমাদের ক্ষেত্রে অনুরূপ ধরনের আচরণ করা হয় না।

আন নাহদাকে এক কথায় ব্যাখ্যা করার জন্য মুসলিম-ডেমোক্র্যাট হলো সবচেয়ে সঠিক পরিভাষা। কারণ দলটি শুরু থেকেই আরব বিশ্বে ইসলাম ও গণতন্ত্রের মধ্যে বিরোধ মীমাংসার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে।

অনুবাদ: মাসউদুল আলম

আন নাহদার সাম্প্রতিক সংস্কার কার্যক্রমের সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য

মনিকা মার্কস

[তিউনিশিয়ার ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দল আন নাহদা সম্প্রতি নিজেদের মধ্যে ব্যাপক সংস্কার সাধন করেছে। রাজনৈতিক ইসলাম সম্পর্কে যারা খোঁজখবর রাখেন, তারা দলটির এই পরিবর্তনে নড়েচড়ে বসেছেন। তিউনিশিয়ার প্রেক্ষাপটে এই অবস্থানকে বিশ্লেষকরা দলটির দূরদর্শিতা হিসেবেই বিবেচনা করছেন। গত ২১–২৫ মে আন নাহদার জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর রাজনৈতিক ইসলাম বিশেষজ্ঞ মনিকা মার্কস এ প্রসঙ্গে **How big were the changes Tunisia's Ennahda party just made at its national congress?** এই শিরোনামে ওয়াশিংটন পোস্টে এই নিবন্ধটি লেখেন। - সম্পাদক]

গত সোমবার তিউনিশিয়ার অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল আন নাহদার জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। ১৯৭৯ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে এটি ছিল দলটির দশম কংগ্রেস। একটি চমকপ্রদ ঘোষণার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানা হয়েছে। একে মসজিদ ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণের ঐতিহাসিক ঘোষণা হিসেবে বিবেচনা করা হলেও আন নাহদা একে ধর্মীয় কার্যক্রম থেকে রাজনীতির পৃথকীকরণ হিসেবে অভিহিত করছে। এছাড়াও দলের নতুন পরিচিতি তুলে ধরা, নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করা, নতুন বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সদস্য সংগ্রহ কার্যক্রমসহ কিছু নতুন পরিকল্পনা এই অধিবেশনে গ্রহণ করা হয়েছে। ধর্ম ও রাজনীতির পৃথকীকরণের আকস্মিক একটি পদক্ষেপ হিসেবেই এই কংগ্রেসকে পাশ্চাত্য মিডিয়া তুলে ধরেছে। অথচ আন নাহদার নেতাকর্মীরা এই পরিবর্তনকে দলটির ভেতরে দীর্ঘদিন ধরে অনুসৃত ধ্যানধারণার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হিসেবেই বিবেচনা করছে। ধর্মের সাথে রাজনীতির পুরোপুরি পৃথকীকরণ নয়, বরং রাজনীতির সাথে ধর্মের সম্পর্ক পুনর্বিবেচনা করে তারা এক ধরনের সমন্বয় করেছে।

এই নতুন ঘোষণা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দলটি তার নেতৃবৃন্দকে ধর্মীয় সংগঠনসহ নাগরিক সমাজের যে কোনো ধরনের সংগঠনের নেতৃত্ব গ্রহণের অনুমতি না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দলটির নেতৃবৃন্দের মসজিদে ধর্মীয় বক্তব্য দেয়ার উপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এমনকি অনানুষ্ঠানিক বা অনিয়মিতভাবেও তারা তা করতে পারবেন না। এর মানে হলো দলটির শুরা কাউন্সিলের সদ্য পুনঃনির্বাচিত দুই সদস্য শায়খ সাদেক শুরো এবং হাবীব আল লাউজের মতো সুপরিচিত ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হয় ধর্মপ্রচার বন্ধ করবেন নয়তো দলীয় পদ ত্যাগ করবেন।

দ্বিতীয়ত, এতোদিন ধরে যারা দলটির কর্মকৌশল ও অর্থনৈতিক নীতিকে পছন্দ করা সত্ত্বেও কঠিন শর্তাবলীর কারণে দলে যোগ দিতে পারেনি, তাদের কথা চিন্তা করে আন নাহদার সদস্যপদের শর্তাবলী সহজ করা হয়েছে। দলটিতে যোগ দিতে হলে এখন আর দুজন দলীয় কর্মীর সত্যায়নের প্রয়োজন পড়বে না। আরো একটি আশ্চর্যজনক পরিবর্তন হলো – এর সদস্যপদের শর্তাবলী থেকে 'আখলাক' (নৈতিকতা) শব্দটি তুলে নেয়া হয়েছে। এই পরিবর্তনের ফলে জীবনযাপন সম্পর্কে দলটির পূর্বেকার রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি মেনে চলার চাপ হয়ত হ্রাস পাবে।

ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্ক সংক্রান্ত এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গিকে দলটির নেতৃবৃন্দ থেকে শুরু করে তৃণমূল সদস্যদের কেউই 'ফাসল' (পৃথকীকরণ) হিসেবে অভিহিত করতে রাজি নন। আন নাহদার শুরা কাউন্সিল ও সংসদ সদস্য ফরিদা লা'বিদীর মতে, "আসলে এটা পৃথকীকরণ নয়, এটা হচ্ছে বিশেষায়িতকরণ (তাখাসসুস)। আমাদের ইসলামী মনোভাব আগের মতোই থাকবে। তারমানে অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সবকিছু ধর্মীয় শিক্ষার (তরবিয়ত) আলোকেই করতে হবে, এমনটা আমরা যুক্তিসঙ্গত মনে করি না।" তার এই বক্তব্যে আন নাহদার অন্যান্য সদস্যের চিন্তার প্রতিফলনই ঘটেছে।

আন নাহদার নেতা হাবীব আল লাউজ রাজনীতির চেয়ে ধর্মীয় কাজেই বেশি মনোযোগী। তার মতে, "যারা যে কাজে পারদর্শী, তাদেরকে সে কাজের সুযোগ করে দেয়াই হলো এই পরিবর্তনের উদ্দেশ্য।" শুরুতে দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকলেও পরে তিনি পরিবর্তনের পক্ষে সমর্থন দেন এই যুক্তিতে, বিশেষায়িতকরণের ফলে উভয় দিকই শক্তিশালী হবে। স্বাধীনভাবে ধর্মীয় কাজে মনোনিবেশ করার জন্য তিনি শুরা কাউন্সিলের দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

হাবীব আল লাউজসহ আন নাহদার নেতৃবৃন্দের অনেকেই মনে করছেন, ক্রমবর্ধমান জিহাদী চরমপন্থীদের মোকাবেলায় আরো কার্যকর ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে তিউনিশিয়ার জন্য এই ধরনের বিশেষায়িতকরণ সহায়ক হবে। সালাফী জিহাদপন্থার

মোকাবেলা করতে হলে তিউশিয়ার ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে ঢেলে সাজানোকে আন নাহদা গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। আননাহদার অনেক সদস্যই মনে করেন, বিপথগামী চরমপন্থীদেরকে ধর্মীয়ভাবে মোকাবেলা করার জন্য দলের সুযোগ্য ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের এটি বিশেষ দায়িত্ব।

একইভাবে, আন নাহদার অধিকাংশ সদস্য মনে করেন, সবার জন্য সদস্যপদ উন্মুক্ত করার পদক্ষেপ নেয়ায় দলের রাজনৈতিক সক্ষমতা আরো বাড়বে। ২০১৪ সালের সংসদ নির্বাচনের সময় আন নাহদা প্রথমবারের মতো ইসলামপন্থী নয় এমন কয়েকজনকে রিক্রুট করে। এদের মধ্যে কয়েকজনকে নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ আসনে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেয়া হয়েছিল, যারা এমনকি আন নাহদার সদস্য পর্যন্ত নন। এই প্রার্থীদের মধ্যে ছয় জন বিজয়ী হয়। এ প্রসঙ্গে আন নাহদার সংসদ সদস্য সাইয়েদা ওয়ানিসির বক্তব্য হলো, "বাইরের কারো অন্তর্ভুক্তির ফলে সামষ্টিক ঐক্য কিংবা দলীয় মূল্যবোধ যে হুমকির মধ্যে পড়েনি, তাদের এই অংশগ্রহণ থেকে তা বুঝা গেছে।"

আন নাহদা নেতৃবৃন্দের ধারণা অনুযায়ী, তাদের ভোটব্যাংক সর্বোচ্চ ৩০ শতাংশ। ভোটের এই সীমা ছাড়িয়ে যেতে হলে দলের একনিষ্ঠ সদস্য ও তাদের পরিবারের বাইরে অবশ্যই নতুন সমর্থকদের আকৃষ্ট করতে হবে। তাদের মতে, একটি পূর্ণাঙ্গ জাতীয় রাজনৈতিক দল হিসেবে পরিপক্কতা অর্জনের লক্ষ্যে ইতিবাচক ভূমিকা দাঁড় করাতে হলে আন নাহদাকে তার দীর্ঘদীনের 'ইসলামপন্থী' পরিচয় থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। কারণ, বোকো হারাম এবং ISIS এর মতো সহিংস গোষ্ঠীগুলোর সাথে এই পরিভাষাটিকে প্রায়ই সংশ্লিষ্ট করা হচ্ছে। এ কারণে জার্মানির 'খ্রিস্টান ডেমোক্র্যাট'দের উদাহরণ সামনে রেখে আন নাহদা আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদেরকে 'মুসলিম ডেমোক্র্যাট' হিসেবে পরিচয় দিয়েছে। আন নাহদার বিরুদ্ধে সহিংস চরমপন্থীদেরকে প্রশ্রয় দেয়ার অভিযোগ ছিল। এর ফলে আন নাহদার কর্মীদের মাঝে যে হতাশা ও নতুন উপলব্ধি তৈরি হয়, এই কৌশলগত নতুন পরিচয়কে তার প্রতিফলন বলা যেতে পারে।

এ ধরনের প্রতীকী ও সত্যিকারের পরিবর্তন তুরস্কের জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টির শুরুর দিকের বহুত্ববাদী (pluralistic) অবস্থানের কথাই মনে করিয়ে দেয়। অযাচিত সামরিক কর্তৃত্বের বিপক্ষে অবস্থান নেওয়া এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জনপ্রিয়তার উপর ভর করে গড়ে ওঠা বৃহৎ ও রক্ষণশীল জাতীয় দল হিসেবে একেপির কাছে ইসলামপন্থী গোষ্ঠীগুলো তখন নিজেদের সঁপে দিয়েছিল। একইভাবে, আন নাহদাও নিজেদের পলিসি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আরব-ইসলামী পরিচয়কে ডিফেন্ড না করে এখন নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রশাসনিক অদক্ষতা ও দুর্নীতিসহ সাধারণ তিউনিশিয়ানদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারগুলোকে প্রাধান্য দিচ্ছে। ২০১২ সালে

শরীয়াহ ও ব্লাসফেমি নিয়ে উত্তেজনাপূর্ণ দীর্ঘ বিতর্কের পর আন নাহদা ঘোষণা দেয়, এ থেকে তারা শিক্ষা নিয়েছে। ফলে জনগণের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে এখন থেকে তারা আরো কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

আন নাহদার আগের গঠনতন্ত্রে ৪০টির মতো ধারা ছিল। প্রায় তিনগুণ বাড়িয়ে নতুন গঠনতন্ত্রে ১৪৬টি ধারা রাখা হয়েছে। এই ব্যাপারটিও দলটির পেশাদার হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা এবং যে কোনো মূল্যে নতুন ভোটারদের আকৃষ্ট করার প্রচেষ্টারই প্রতিফলন। দলটিকে বছরের পর বছর বিভিন্ন সরকারের বিরূপ মনোভাব মোকাবেলা করে টিকে থাকতে হয়েছে। সে কারণে গত দুই বছরে নিজের রাজনৈতিক অবস্থান শক্তিশালী করতে তারা সতর্কতার সাথে কাজ করেছে। তারপরও এই কংগ্রেসে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা, নানা ধরনের সমঝোতামূলক পদক্ষেপের কারণে হতাশ হয়ে আন নাহদার ১০-১৫ শতাংশ ভোটার দল থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। তবে ২০১৯ সালের সংসদীয় নির্বাচনে দলটি এরচেয়েও বেশি নতুন ভোটার আকৃষ্ট করতে পারবে বলে আশা করা হচ্ছে।

'দল ও আন্দোলনের' এই পরিবর্তিত সম্পর্কের ব্যাপারে আন নাহদার সমর্থক ও নেতৃবৃন্দের অনেকেই শুরুতে দ্বিধান্বিত ছিলেন। তারপরেও ২০১৬ সালের এই বসন্তে এসে তাদের অধিকাংশই এই পরিবর্তনকে সমর্থন দিতে সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছেন। সপ্তাহের শেষান্তে এই পরিবর্তন বিপুল সংখ্যাগরিষ্টতা লাভ করেছে; অর্থাৎ দুই-তৃতীয়াংশ বা তারচেয়েও বেশি সদস্য এর পক্ষে ভোট দিয়েছেন।

আন্দোলন (হারাকা) থেকে দলীয় (হিজব) কার্যক্রমকে আনুষ্ঠানিকভাবে পৃথক করা আন নাহদার জন্য তুলনামূলক সহজই ছিল বলা যায়। কারণ, দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে এক ধরনের ক্ষীণ যোগাযোগ থাকলেও বিপ্লবের পর থেকে দলটি মূলত রাজনৈতিক দল হিসেবেই তৎপরতা চালাচ্ছে। সাবেক প্রেসিডেন্ট যাইন আল আবেদীন বেন আলীর দমনপীড়নের কারণে মিশরের মুসলিম ব্রাদারহুডের মতো তিউনিশিয়ায় আন নাহদা ধর্মীয় সংগঠন ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানের কার্যকর ও শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে পারেনি।

প্রস্তাবিত পরিবর্তন নিয়ে নিজেদের মধ্যে নিবিড় আলাপ-আলোচনায় মনোযোগী থাকায় এই জাতীয় সম্মেলন দুই বছর দেরিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ তো বটেই, নেতৃবৃন্দের সাথে মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের মধ্যে পর্যন্ত এই বিষয়গুলোর খুটিনাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তিউনিশিয়ার অধিকাংশ রাজনৈতিক দলই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বেশ দুর্বল। কয়েকজন বড় বড় ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করেই দলগুলো গড়ে ওঠেছে। তবে আন নাহদার অভ্যন্তরে প্রতিনিধিত্বমূলক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান

গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দলটি অনেক দূর এগিয়ে গেছে। দলের সদস্যদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রাখার কারণে কংগ্রেস ও শুরা কাউন্সিলে গৃহীত 'এক ব্যক্তি, এক ভোট' এই সুচিন্তিত নীতি দলের সদস্যরা মেনে নিয়েছে। এর ফলে তৃণমূল পর্যায়ের অধিকাংশ সমর্থককে সন্তুষ্ট রেখেই সম্ভাব্য বিতর্কিত পরিবর্তনগুলোর পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়া দলটির পক্ষে সহজ হয়েছে।

তাছাড়া দলটির নেতৃবৃন্দ আকস্মিকভাবে পরিবর্তনের ঘোষণা না দিয়ে আন নাহদার ঐতিহাসিক বিকাশের স্বাভাবিক পরিণতি আকারেই পরিবর্তনগুলো এনেছেন। এর ফলে দলের সদস্যরা এই পদক্ষেপকে একটি প্রফেশনাল দল হিসেবে গড়ে ওঠার লক্ষ্যে আন নাহদার ধারাবাহিক বিবর্তনের ফলাফল এবং বহুল প্রতীক্ষিত ব্যাপার হিসেবে বিবেচনা করছেন। আন নাহদার বেশ পুরনো একজন নেতা আবদেল হামিদ জেলাসির মতে, "বেন আলীর শাসনামলে সত্যিকারের রাজনীতি করার সুযোগ আমাদের ছিল না। তাই কর্মীদেরকে সংগঠিত রাখা এবং কাজ করার জন্য নানা ধরনের উপায় অবলম্বন করতে হয়েছে। যেমন – আমরা মসজিদে একত্রিত হতাম।"

এই ন্যারেটিভ ইসলামপন্থাকে এক ধরনের পরিস্থিতিনির্ভর লিবারেশন থিওলজি হিসেবে চিত্রায়িত করে। অর্থাৎ, স্বৈরশাসকরা দশকের পর দশক ধরে আন নাহদাকে নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক তৎপরতা চালাতে না দেয়ায় ইসলামপন্থা একটি সরকারবিরোধী প্লাটফরম হিসেবে গড়ে ওঠেছে। বর্তমান সময়ে ইসলামপন্থার উপযোগিতা থাকা সত্ত্বেও আন নাহদার অনেক নেতাই এখন যুক্তি দিচ্ছেন, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ থাকায় যে যে ধরনের লিবারেশন অর্জিত হয়েছে তাতে করে এখন আর ইসলামপন্থার আশ্রয় নেয়ার দরকার থাকছে না। কেননা, ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর জন্যও সরকার পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ে বাস্তবমুখী হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। 'বিরোধী পক্ষের হাতিয়ার হিসেবে ইসলামপন্থা যতটা কার্যকর, সরকার পরিচালনার জন্য ততটা নয়' – আন নাহদার একজন শীর্ষনেতা সাঈদ ফারজানী গত মার্চে এ মন্তব্য করেন।

গণতন্ত্রই সর্বোত্তম পন্থা – আন নাহদার নেতাকর্মীদের মধ্যে এই উপলব্ধি আসার ফলেই তারা দশম কংগ্রেসে উদারপন্থা ও ইতিবাচক লক্ষ্য-উদ্দেশ্যগুলোকে গ্রহণ করে নিতে পেরেছে। তিউনিশিয়ার পরিবর্তন প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপে সেকুলার এবং ইসলামপন্থী – উভয় পক্ষের মাঝে এক ধরনের ভীতিজনিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। প্রত্যেকেই নিজেদের আইডেন্টিটিকে তিউনিশিয়ার নতুন সংবিধান ও বিপ্লবোত্তর রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট ছিল। এই প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের অস্তিত্ব নিশ্চিত করা এবং নীতিনির্ধারণী একটি পক্ষ হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করা। আন নাহদার ইসলামপন্থীরা মিডিয়ার বিদ্বেষ এবং সরকারী প্রশাসনের

বৈরীতার সম্মুখীন হয়েছিল। তিউনিশিয়ার গণতান্ত্রিক অর্জনকে উল্টে দেয়ার লক্ষ্যে একটি প্রতিবিপ্লবের ভয়ও দলটির ছিল। ২০১৩ সালে মিশরে যেমনটি ঘটেছিল। এমনটি হলে ইসলামপন্থীদেরকে পুনরায় জেল কিংবা নির্বাসনে যেতে হতো।

বাইরের কেউ আন নাহদায় যুক্ত হওয়ার ব্যাপারে কর্মীদের মধ্যে অস্বস্তি থাকার পেছনে ঐতিহাসিক বাস্তবতা যেমন আছে, আবেগের ব্যাপারও আছে। দলের সদস্য বাড়ানোর নতুন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এই অস্বস্তি এক ধরনের চ্যালেঞ্জ হিসেবে হাজির হয়েছে। এ সংক্রান্ত কংগ্রেসের পরিবর্তনের ব্যাপারে শুরুতে কর্মীদের সমালোচনা ছিল। যেমন – নতুন কেউ হয়তো দলের ভেতর 'অনুপ্রবেশকারী' হিসেবে ঢুকে পড়বে! বেন আলীর দল প্রায়ই এ ধরনের এজেন্ট ঢোকানোর চেষ্টা করতো। কিংবা কেউ হয়তো নিজস্ব স্বার্থে বা সুবিধাবাদী উদ্দেশ্য নিয়ে দলকে ব্যবহার করবে।

আরেকটা নীরব ভীতি আন নাহদার কিছু কর্মীর মধ্যে কাজ করে, সেটি হলো – কর্মীদের কাছে দলকে পরিবারের মতোই যতটা নিরাপদ ও সুরক্ষিত মনে হতো, সবার জন্য দলকে উন্মুক্ত করে দিলে আন্দোলনের সেই পরিবেশ হয়তো বিঘ্নিত হবে। আন নাহদার কর্মীরা প্রায়ই বলে থাকেন, বছরের পর বছর ধরে তাদের উপর যখন রাজনৈতিক জেল-জুলুম চলছিল কিংবা যখন কেউ নির্বাসনে যেতে বাধ্য হতো, তখন শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষুর ভয়ে তাদের রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়স্বজনরা ভীতস্বন্ত্রস্ত থাকত। তারা কোনো সহায়তা করতে পারতো না। আন নাহদার কর্মীরাই তখন তাদের পাশে দাঁড়াতো। দলকে সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিলে এই ধরনের দৃঢ় ভ্রাতৃত্ববোধের সংস্কৃতি হয়তো দুর্বল হয়ে পড়বে।

সর্বশেষ পরিবর্তনগুলো সত্ত্বেও আন নাহদার অভ্যন্তরীণ সংস্কৃতি সম্ভবত ধর্মীয় রক্ষণশীল হিসেবেই থেকে যাবে। সমুদ্র তীরবর্তী হামেমেত শহরের যে হোটেলে এই কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে মদ পরিবেশন করা হয় না। মিশরের ইসলামপন্থী বুদ্ধিজীবী ফাহমী হুয়াইদীসহ কংগ্রেসে আমন্ত্রিত অন্যান্য বিখ্যাত ধর্মীয় চিন্তাবিদগণও সম্ভবত আন নাহদার নেতা রশিদ ঘানুশীর পাশেই থাকবেন। এতোসব গুরুত্বপূর্ণ প্রতীকী ও বাস্তব পরিবর্তন সত্ত্বেও আরো দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আন নাহদার সামগ্রিক সাংগঠনিক বিন্যাসে ইসলামপন্থার একটা ছাপ সম্ভবত থেকেই যাবে। গতিপথ পরিবর্তন হলেও দলের অভ্যন্তরীণ সংস্কৃতি বহাল থাকায় কর্মীরা এখানে আগের মতোই স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপদ বোধ করবে।

দশকের পর দশক ধরে আন নাহদা যে ধরনের রাজনৈতিক দমনপীড়নের শিকার হয়েছে, তাতে করে পরিবর্তনের পূর্বশর্ত হিসেবে ন্যূনতম মাত্রার স্থিতিশীলতার দরকার ছিল। পূর্বেকার নজরদারিনির্ভর, নির্বতনমূলক স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার

মোকাবেলায় টিকে থাকার জন্য আন নাহদা যেসব কৌশল অবলম্বন করেছিল, সেসবের প্রয়োজনীয়তা ও প্রাসঙ্গিকতা যে আর থাকছে না, তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য তিউনিশিয়ার রাজনীতির গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে উত্তরণের ব্যাপারে আস্থা তৈরির দরকারও ছিল।

যাইহোক, আন নাহদার কংগ্রেসে গৃহীত এই পরিবর্তনের পেছনে তিউনিশিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট বেজি সাঈদ এসেবসির মূখ্য ভূমিকাও অনস্বীকার্য। যদিও কেউ এতোটা ভাবেনি। নিদা তিউনিশ দলের প্রতিষ্ঠাতা এসেবসি আগে আন নাহদার কঠোর সমালোচনা করলেও এখন তিনি আর সেই অবস্থানে নেই। এসেবসি ও ঘানুশীকে একত্রে সম্বোধন করতে প্রায়ই মজা করে 'দুই শায়খ' হিসেবে অভিহিত করা হয়। ২০১৩ সালে বার্দো জাতীয় জাদুঘরে আক্রমণের ফলে সৃষ্ট সংকট থেকে উত্তরণে এই দুই নেতা পরস্পরকে সহযোগিতা শুরু করেন। ওই সংকট এমন এক রাজনৈতিক অচলাবস্থা তৈরি করে, যাতে তিউনিশিয়ার সম্ভাবনাময় পালাবদল অঙ্কুরেই বিনষ্ট হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছিল। সে সময়ের নেপথ্য আলোচনাই নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী ন্যাশনাল ডায়ালগ কোয়ার্টেট'কে বিদ্যমান সংকট নিরসনে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালনের পথ করে দিয়েছিল।

কংগ্রেসের প্রধান বক্তা সাইদ এসেবসি যখন লম্বা লম্বা পা ফেলে মঞ্চে ওঠে আসেন, তখন সবচেয়ে নাটকীয় মুহূর্তের অবতারণা হয়। উপস্থিত হাজারো মানুষের মুহুর্মুহু করতালি এবং 'বেজি! বেজি!' হর্ষধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে সম্মেলনস্থল। আন নাহদার সাথে নিদা তিউনিশের জন্মগত বিরোধ (আন নাহদার বিরোধী হিসেবে ২০১২ সালে দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়), ২০১৩ সালের চরম বিবাদমূলক ঘটনাসমূহ এবং ২০১৪ সালের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন দল দুটিকে একে অপরের বিরুদ্ধে ঠেলে দিয়েছিল। এই ব্যাপারগুলো যারা জানে, তাদের কাছে সেই মুহূর্তটি ছিল পরাবাস্তব ঘটনার মতো।

উপস্থিত লোকদের মাঝে বয়ে যাওয়া স্বস্তির বাতাস সহজেই টের পাওয়া যাচ্ছিল। যার ব্যাপারে অনেকের ভয় ছিল যে, তিনি হয়তো তাদেরকে আবারো কারাগারে নিক্ষেপ করবেন; সেই তিনিই কিনা আন নাহদার স্বাভাবিক পথচলার এই ক্রান্তিলগ্নে স্বয়ং অংশগ্রহণ করলেন! ২০১৪ সালে যিনি আন নাহদাকে পশ্চাৎপদ, ক্রিমিনাল, সন্ত্রাসবাদের প্রশ্রয়দাতা – এসব ভাষায় তীব্র আক্রমণ করেছিলেন, এবার সেসবের পুনরাবৃত্তি না করে তিনি বরং স্বীকৃতি দেন যে, আন নাহদা 'সঠিক পথেই চলছে'। দলটিকে তিউনিশিয়ার রাজনীতির একটি নির্ভরযোগ্য জোট সদস্য এবং বৈধ প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবেও তিনি অভিহিত করেন।

পাশ্চাত্য মিডিয়া আন নাহদার কংগ্রেসের সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে মসজিদ ও রাষ্ট্রের মধ্যকার অভাবিত ও আরোপিত পৃথকীকরণের উপর ফোকাস। অথচ, সমঝোতার জন্য নতুন উদ্যোগ গ্রহণই হলো এই কংগ্রেসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

ঘানুশী ও এসেবসির যৌথ নেতৃত্বে সমঝোতার (তাওয়াফুক) যে রাজনীতি শুরু হয়েছে, তা অব্যাহত রাখার পক্ষে কংগ্রেস ভোট দেয়। কংগ্রেসে আমন্ত্রিত জাতীয় পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিনিধিরা এই ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেন। ভোটের ফলাফলে দেখা যায়, দুই-তৃতীয়াংশ বা তারও বেশি কংগ্রেস ডেলিগেট ঘানুশী সমর্থিত রাজনৈতিক ঐক্যমত ও সমঝোতার প্রস্তাবকে দৃঢ় সমর্থন দেন।

সবাইকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার এই বাস্তবসম্মত নীতি থেকে বুঝা যায়, অপেক্ষাকৃত প্রাগ্রসর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বই শুধু নয়, সামগ্রিকভাবে আন নাহদাই গত চার বছরে যথেষ্ট রাজনৈতিক শিক্ষা অর্জন করেছে। আন নাহদার সামনে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে নিছক অনুকূল একটি জোট গঠনের পরিবর্তে সত্যিকারের কার্যকর একটি জোট গড়ে তোলা, যেটি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে তিউনিশিয়ার লড়াই, প্রশাসনিক অদক্ষতা, দুর্নীতি ও তরুণদের বেকারত্ব দূর করতে কাজ করবে। এর মাধ্যমেই অর্জিত রাজনৈতিক শিক্ষার প্রকৃত বাস্তবায়ন ঘটবে।

অনুবাদ: আইয়ুব আলী

জাতীয় ঐক্য ও গণতন্ত্রের স্বার্থে ম্যান্ডেলার মতো ঘানুশীও সবকিছু করতে প্রস্তুত

ডেভিড হার্স্ট

[মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক 'মিডল ইস্ট আই' ম্যাগাজিনের প্রধান সম্পাদক ডেভিড হার্স্ট ও সাংবাদিক পিটার ওবোর্ন যৌথভাবে রশিদ ঘানুশীর একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন এবং এর আলোকে ম্যাগাজিনটিতে এই বিশ্লেষণী প্রতিবেদন লিখেন। - সম্পাদক]

তিউনিসের প্রাণকেন্দ্রে আমাদের হোটেলের সদর দরজার ঠিক বাইরেই হাবিব বুরগিবার একটি স্মারক ভাস্কর্য রয়েছে।

বুরগিবাকে কেউ কেউ জাতির জনক মনে করেন, আর অন্যরা তাকে কুখ্যাত স্বৈরশাসক হিসেবেই বিবেচনা করেন। ব্রোঞ্জ নির্মিত এই ভাস্কর্যের মাধ্যমে তার অতীত মহিমাই যেন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অশ্বারোহী বুরগিবা যেন সবাইকে ছাপিয়ে অনুসরণীয় হয়ে ওঠেছেন। দৃশ্যটি প্যারিসের চ্যাম্পস এলিসিতে স্থাপিত নেপোলিয়নের মূর্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

তিরিশ বছর পূর্বে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার আগে প্রেসিডেন্ট হিসেবে বুরগিবা বিরোধী দলের একজন শীর্ষনেতাকে পুনরায় বিচারের আওতায় আনার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। ওই নেতার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডকে বুরগিবা যথেষ্ট মনে করেননি। তাই তিনি তাকে ফাঁসিতে ঝোলাতে চেয়েছিলেন। মৃত্যুদণ্ডের জন্য অপেক্ষমান এই ব্যক্তিটি ছিলেন শায়খ রশিদ ঘানুশী। আরব বসন্তের আধ্যাত্মিক নেতা। বিপ্লবোত্তর তিউনিশিয়ার জনক বলে অনেকে যাকে সম্মান করে থাকেন।

বুরগিবার পর ক্ষমতায় আসেন আরেক স্বৈরশাসক বেন আলী। তিনি বুরগিবা ও তার ঘোড়ার ভাস্কর্যকে ঝেটিয়ে বিদায় করেন। পরবর্তীতে আমরা এই ভাস্কর্য সম্পর্কে শায়খ ঘানুশীর মতামত জানতে চাইলে তিনি জবাব দেন:

> "বুরগিবা অনেক বড় মাপের ব্যক্তিত্ব। আপনি চাইলেই তাঁকে আমাদের ইতিহাস থেকে মুছে ফেলতে পারবেন না। তিউনিশিয়াকে স্বাধীন করার জাতীয় আন্দোলনের তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আমি তা অস্বীকার করতে পারি না। এটা হচ্ছে বাস্তবতা। আমি যদিও তার ভাস্কর্যের পক্ষে নই, তবে এটি আমার জন্য কোনো সমস্যাও নয়।"

বুরগিবা ও বেন আলী দুজনেই হাজার হাজার ইসলামপন্থীকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন, নির্যাতন করেছেন এবং জোরপূর্বক নির্বাসনে পাঠিয়েছেন।

সংসদে আন নাহদার তুলনায় সংখ্যালঘু দল নিদা তিউনেসকে সমর্থন করা আন নাহদার জন্য কোনো সমস্যা নয়। যদিও নিদা তিউনেস প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যই ছিল ইসলামপন্থীদের বিতাড়িত করা এবং সেকুলার শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। তাদের সাথে মিলে সরকার গঠন কিংবা বর্তমান প্রেসিডেন্ট বেজি সাইদ এসেবসিকে সমর্থন প্রদান – কোনোটিতেই আন নাহদার আপত্তি নেই। উল্লেখ্য, এসেবসি ছিলেন বুরগিবা সরকারের মন্ত্রী।

নিদা তিউনেসের একটি সূত্র মিডল ইস্ট আইকে জানিয়েছে, আন নাহদার সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগির যে সমঝোতা হয়েছে তা পরিত্যাগ করার শর্তে এসেবসির নিকট আরব আমিরাত প্রস্তাব দিয়েছিল, তিউনিশিয়াকে ৫ থেকে ১০ বিলিয়ন ডলার দেয়া হবে। তবে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।

এ ব্যাপারে ঘানুশীর বক্তব্য হলো,

> "আমাদের প্রেসিডেন্টের উপর আমার যথেষ্ট আস্থা রয়েছে। তার দেশপ্রেমের প্রতিও আমার আস্থা রয়েছে। তাছাড়া তিনি তিউনিশীয় জনগণের দ্বারা নির্বাচিত। ফলে বাইরের কোনো শক্তির সমর্থনের উপর তার ক্ষমতা নির্ভরশীল নয়।"

সমঝোতার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় নেলসন ম্যান্ডেলা যা করেছেন, ঘানুশীও স্পষ্টত তাই করছেন। একইসাথে তিউনিশিয়ান এই নেতা রাজনীতির কঠিন বাস্তবতাকেও আমলে নিচ্ছেন। তার ধারণা, এসেবসিকে তিনি সঠিক পথেই রাখতে পারবেন।

> "তিনি জানেন, জনগণের বিরাট একটা অংশ আন নাহদাকেও নির্বাচিত করেছে। আর সরকারকে শক্তিশালী করতে আন নাহদাকে তার প্রয়োজন রয়েছে। আবার, আমাদের রাষ্ট্র ও সরকারের একটি শক্ত ভিত এবং ক্ষমতার ভারসাম্য গড়ে তোলার জন্য তার দলকে আমাদের প্রয়োজন। ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যমেই ক্ষমতা টিকে থাকে। তিউনিশিয়ায় ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করার স্বার্থে প্রেসিডেন্ট, তার দল এবং আমাদের দলকে একযোগে কাজ করতে হবে। ৭০

> শতাংশেরও বেশি তিউনিশীয় যে গণতন্ত্র অক্ষুন্ন রাখতে আগ্রহী তা সব জনমত জরিপে প্রতিফলিত হয়েছে। তাই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে চক্রান্তের মাধ্যমে কারো পক্ষে ক্ষমতায় যাওয়া সহজ হবে না।"

তিউনিশীয় এই নেতা নিছক এ ধরনের সমঝোতার উদ্যোগেই থেমে যাননি। তার দ্বিতীয় পদক্ষেপটিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

গত মাসে অনুষ্ঠিত আন নাহদার দশম কংগ্রেসে ঘানুশী যে ঘোষণা দিয়েছেন, সেটাই হলো প্রকৃতপক্ষে তার সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ, সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণও বটে। যার বর্ণাঢ্য জীবন রাজনৈতিক ইসলামের সমার্থক বলে বিবেচিত, সেই তিনিই ঘোষণা করলেন, তার দেশে রাজনৈতিক ইসলামের আর প্রয়োজন নেই। দাওয়াতী কাজ এবং মসজিদভিত্তিক কার্যক্রম থেকে সরে এসে আন নাহদা এখন থেকে কেবল একটি রাজনৈতিক দল হিসেবেই কাজ করবে। তবে এর ইসলামী চরিত্র বজায় থাকবে।

এ ব্যাপারে ঘানুশী বলেন,

> "আমাদের দলে কয়েকজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব রয়েছেন। সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়ে যাওয়ার পর এখন তাদেরকে সংসদে যেতে হবে। সেক্ষেত্রে ইমামের দায়িত্বে থাকা যাবে না। ইমামের দায়িত্বে থাকতে চাইলে পার্লামেন্টে যাওয়া যাবে না। এ দুটির যে কোনো একটি তাদেরকে বেছে নিতে হবে।"

এই নীতি দলের যে কোনো কর্মীর মতোই তার নিজের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য হবে বলে তিনি স্পষ্ট করেছেন। উল্লেখ্য, তিনি নিজেও একজন সুপরিচিত ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব।

আমরা প্রশ্ন করেছিলাম, এই সিদ্ধান্ত কি যুক্তরাজ্যের লেবার পার্টির অনুচ্ছেদ-৪ বিলুপ্তির মতোই তাৎপর্যপূর্ণ? উল্লেখ্য, ৪ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী লেবার পার্টি রাষ্ট্রকেই উৎপাদনের উপকরণের মালিক হিসেবে স্বীকৃতি দিতো। কিন্তু ১৯৯৪ সালে ব্ল্যাকপুলে অনুষ্ঠিত বৈঠকে টনি ব্লেয়ার অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত করেন। এর মাধ্যমে লেবার পার্টির নবযাত্রা সূচিত হয়।

এর সাথে একমত পোষণ করে ঘানুশী বলেন,

> "হ্যাঁ। ধর্মের সাথে না জড়িয়ে রাজনৈতিক ময়দানে কাজ করার উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের আন্দোলনের নবসূচনা করতে চাই। আমরা আন আহদার নতুন পরিচয় তুলে ধরতে চাই। বিপ্লবের আগে আমরা মসজিদ, ট্রেড ইউনিয়ন ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে মিশে গিয়েছিলাম। কারণ, তখন সত্যিকারের রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন আমরা প্রকাশ্যে রাজনৈতিক তৎপরতা চালাতে

> পারছি। তাই এখন আর মসজিদে রাজনীতি করার দরকার কী? বরং রাজনৈতিক দল হিসেবে আন আহদার প্রকাশ্যেই রাজনীতি করা উচিত।"

'ঘানুশী ইসলামকেই বাদ দিয়ে দিচ্ছেন' এই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে তিনি বলেন,

> "আমরা সিভিল পার্টির ধারণাকে গ্রহণ করেছি। যাতে করে আমরা ইসলামের অলঙ্ঘনীয় বিষয়গুলো এবং ব্যাখ্যার সুযোগ থাকা বিষয়গুলোর মধ্যে পার্থক্য করতে পারি। রাজনৈতিক ক্ষেত্র কোনো ঐশ্বরিক বিষয় নয়, অপরিবর্তনীয় ব্যাপারও নয়। এটি নাগরিক ও মানবীয় ব্যাপার। এটি ইজতিহাদ তথা স্বাধীন মানবীয় যুক্তিবোধের আলোকে পরিচালনার জন্য উন্মুক্ত একটি ব্যাপার। অনেক মুসলমানই ধর্মগ্রন্থের বিষয়বস্তু সংক্রান্ত এই শ্রেণীবিভাগকে গুলিয়ে ফেলেন। কোরআন-হাদীসের সকল অংশকেই তারা অলঙ্ঘনীয় ও তর্কাতীত মনে করেন। তাদের ধারণা, এগুলোর কেবল একটিমাত্র অর্থই হতে পারে। কোরআন-হাদীসের রাজনীতি সংক্রান্ত বক্তব্যগুলোকে ব্যাখ্যা করার সুযোগ রয়েছে। আমরা এখন যা করছি, এটা ঠিক তা-ই।"

তবে রাজনৈতিক ইসলামকে তিনি পশ্চিমা ধারণা হিসেবেই দাবি করেছেন। আর অন্তত তিউনিশিয়ায় রাজনৈতিক ইসলামের সাথে 'ইসলামিক স্টেট' গ্রুপটিকে (আরবীতে যাদের 'দায়েশ' বলা হয়) গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। তাই তিনি রাজনৈতিক ইসলাম ত্যাগ করছেন।

> "আমি রাজনৈতিক ইসলামের সাথে আর সংশ্লিষ্ট না থাকার অন্যতম একটি কারণ হলো, 'দায়েশ' এখন রাজনৈতিক ইসলামের অংশ হয়ে গেছে। তাই আমি নিজেকে 'দায়েশ' থেকে আলাদা করতে চাই। আমি হলাম মুসলিম ডেমোক্র্যাট, আর তারা গণতন্ত্রবিরোধী। দায়েশ গণতন্ত্রকে হারাম মনে করে। দায়েশ এবং আমাদের মাঝে বিস্তর ফারাক আছে। আমি বলছি না যে, তারা মুসলমান নয়। তবে তারা ক্রিমিনাল। তারা স্বৈরতন্ত্রী। দায়েশ স্বৈরতন্ত্রেরই আরেকটা রূপ। অন্যদিকে, আমাদের বিপ্লব হচ্ছে গণতান্ত্রিক বিপ্লব। ইসলামী মূল্যবোধ গণতন্ত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।"

আত্মপরিচয়ের রাজনীতির পরিবর্তে জনগণের রাজনীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিপ্লবোত্তর তিউনিশীয় রাজনীতির মৌলিক পরিবর্তনের জন্য ঘানুশী চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তিনি মনে করেন, চারপাশের চলমান বিশৃঙ্খলা থেকে তিউনিশিয়াকে নিরাপদ রাখার এটাই একমাত্র উপায়।

যাই হোক, পরিবর্তনের এই প্রচেষ্টা ঘানুশীর দলটিকে দেশ ও বিদেশে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিতে পারে। প্রশ্ন উঠতে পারে, আন নাহদার সামাজিক শক্তিগুলো কেন দলটির প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখবে? মিশর, ইয়েমেন ও সিরিয়ার ইসলামপন্থী অর্থাৎ, যাদের নিরাপত্তার জন্য অনুকূল রাষ্ট্রীয় শক্তি নেই, তাদের উপর আন নাহদার এই পরিবর্তনের প্রভাব কী হতে পারে?

এই পরিবর্তনের অভ্যন্তরীণ প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া নিয়ে ঘানুশী তেমন একটা ভাবছেন না। তার মতে, অনেকেই দল ছেড়ে যাবে। তারচেয়েও বেশিসংখ্যক লোক দলে যোগ দেবে বলে তিনি আশা করছেন। তবে তার এই সিদ্ধান্তের আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া কী হবে, সে প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সঙ্গত কারণেই তিনি বেশ সতর্ক। যুদ্ধের মাঝখানে দলত্যাগ করার মতো অভিযোগও তার বিরুদ্ধে আসতে পারে।

এ ব্যাপারে তিনি জোর দিয়ে বলেন, আননাহদার এ সিদ্ধান্ত শুধু তিউনিশিয়ার জন্যই। তিনি স্বীকার করেছেন, যেসব রাষ্ট্রে ইসলাম এখনো নিপীড়িত সেখানে একটি বৈপ্লবিক আদর্শ হিসেবে রাজনৈতিক ইসলাম কাজ করতে পারে। কিন্তু তিউনিশিয়ায় এর আর দরকার নেই।

মিশরের মুসলিম ব্রাদারহুডের প্রতি পরামর্শ

মিশরের মুসলিম ব্রাদারহুডকে সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেন,

> "এই অঞ্চলের সকল ইসলাপন্থীদের প্রতি আমাদের উপদেশ হলো –অন্যদের সাথে মিলে কাজ করার জন্য এবং ঐক্যমত গড়ে তোলার জন্য তাদেরকে আরো বেশি উদারতার পরিচয় দেয়া উচিত। কারণ, স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় প্রতিরোধ গড়ে তোলা ব্যতীত মুক্তি অর্জন সম্ভব নয়। ইসলামপন্থী-সেকুলারপন্থী এবং মুসলিম-অমুসলিমদের মাঝে সত্যিকারের সমঝোতা গড়ে তোলা প্রয়োজন। এসব পক্ষের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ফলে স্বৈরতন্ত্রই লাভবান হয়।"

মুসলিম ব্রাদারহুডের সাথে ঘানুশী সাংগঠনিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। আন নাহদা এখন থেকে আর ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন অব দ্য মুসলিম ব্রাদারহুডের সদস্য থাকছে না। তবে ঘানুশী নিজে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব মুসলিম স্কলারস এবং ইউরোপিয়ান ফতোয়া কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে থাকছেন। উভয় প্রতিষ্ঠানই অরাজনৈতিক। যদিও দুটি প্রতিষ্ঠানেরই প্রধান হচ্ছেন মুসলিম ব্রাদারহুডের শীর্ষতম স্কলার ইউসুফ আল কারযাভী।

রাজনৈতিক ইসলামের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার যে ঘোষণা ঘানুশী দিয়েছেন, তা পাশ্চাত্যের প্রশংসা কুড়িয়েছে। কারণ, পাশ্চাত্য এই ঘোষণাকে আধুনিকতার পথে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে মনে করছে। যাইহোক, আরব বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে এ ঘোষণাকে ভীতির সাথে গ্রহণ করেছে। ইসলাম ও গণতন্ত্রের সম্মিলনের ব্যাপারে যিনি সবচেয়ে সম্মানিত কণ্ঠস্বর তিনিই কিনা এই আন্দোলন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন! অথচ এর সাথেই তিনি সারাজীবন জড়িত ছিলেন! – এই ধরনের হতাশা তাদের মধ্যে কাজ করছে।

ঘানুশীর চিন্তার এই পরিবর্তনের পেছনে কিছু বাস্তব কারণও রয়েছে। তিনি দেখেছেন, আরব স্বৈরতন্ত্রের অধীনে থাকা গণমানুষের জন্য দুটি উপায় রয়েছে – স্বৈরতন্ত্রকে মেনে নেয়া, নয়তো সালাফী চরমপন্থার পথ বেছে নেয়া। এর বাইরে নতুন আরেকটা পথ তিনি দেখিয়েছেন।

এ বিষয়ে ঘানুশীর সহযোগীদের বক্তব্য হলো, এটা এক ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যা শুধু তিউনিশিয়ার ক্ষেত্রেই প্রাসঙ্গিক। এখনই এ ব্যাপারে মূল্যায়ন করার সময় হয়নি। ঘানুশীর মেয়ে বিশিষ্ট কলামিস্ট সুমাইয়া ঘানুশী লিখেছেন,

> "আমরা যে পরীক্ষা-নিরীক্ষাটি করছি, তা একান্তই স্থানীয় ব্যাপার এবং তিউনিশিয়ার প্রেক্ষাপটেই এটি প্রযোজ্য। অত্র অঞ্চলের অন্যান্য দেশে এই পদ্ধতিটিই প্রয়োগ করতে হবে, ব্যাপারটি তা নয়। প্রত্যেকটি দেশেরই নিজস্ব প্রেক্ষাপট ও সমস্যা রয়েছে। ... শেষ পর্যন্ত সময়ই কেবল এ ব্যাপারে চূড়ান্ত মূল্যায়ন করতে পারবে এবং কোনটা সঠিক তা বলতে পারবে। তাই এখনই কোনো ধরনের মূল্যায়ন করা যাবে না। হোক তা ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক।"

নতুন পরিচয়ের আন নাহদা নাম পরিবর্তন করতেও পারে। নতুন নাম হতে পারে কনজার্ভেটিভ পার্টি। তাছাড়া সামনে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ঘানুশীর প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ানোর যে গুজব শোনা যাচ্ছে, তা তিনি একেবারে উড়িয়ে দেননি। প্রেসিডেন্ট হওয়ার কোনো সুযোগ তৈরি হলে কী করবেন– এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "এটি নিয়ে কখনো ভাবিনি।"

তিউনিশিয়া হচ্ছে আরব বসন্তের আঁতুড়ঘর। দেশটি আবারো আরব বিশ্বকে এক নতুন পথ দেখানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে। কিন্তু এ প্রচেষ্টা কি সফল হবে? তিউনিশীয় গণতন্ত্র এখনো বেশ নাজুক। পর্যটন শহর সুসা'য় গতবছর সংঘটিত ব্রিটিশ পর্যটকদের উপর আইএসপন্থীদের নির্বিচার গুলিবর্ষণের ঘটনা থেকে এটি স্পষ্ট প্রমাণিত।

রাজধানী তিউনিসে ঘানুশীর সিদ্ধান্তকে বেশ সাদরেই গ্রহণ করা হয়েছে। তবে দেশের অন্যান্য অঞ্চলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। এ বিষয়টি আমরা বুঝতে পারি, যখন রাজধানী থেকে ২'শ কিলোমিটার দক্ষিণে দেশটির কেন্দ্রে অবস্থিত শহর সিদি বুজিদে পৌঁছি। এখানেই পাঁচ বছর আগে হতাশাগ্রস্ত ফল বিক্রেতা মোহাম্মদ বুআজিজি নিজের গায়ে আগুন ধরিয়ে মৃত্যুবরণ করার মাধ্যমে আরব বসন্তের সূচনা করে যান।

বিপ্লবের আগেই তো ভালো ছিলো!

বুয়াজিজি যেখানে আত্মহত্যা করেন, তারচেয়ে বড়জোর ১০০ মিটার দূরের একটি ক্যাফেতে বসে আমরা চার যুবকের সাথে কথা বলেছিলাম। তারা কফি পান করছিলো। তাদের মধ্যে মাত্র দুইজনের চাকরি আছে। এদের একজন হাতেম। তেল শ্রমিক। তিনি বললেন, "কোনোই উন্নতি হয়নি। কোনো পরিবর্তনও আসেনি।" তিনি আমাদেরকে জানালেন, তার পরিচিতদের মধ্যে এমনও লোক আছে যারা দায়েশ যোদ্ধাদের সাথে যোগ দিতে ইরাক ও সিরিয়ায় গিয়েছে। এছাড়া তিনি এমন লোকদেরও চেনেন যারা অভিবাসী হিসেবে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে উত্তরে যাচ্ছে।

ক্যাফের উল্টো দিকে জুতা বিক্রেতা আবদেল কাদেরের সাথে কথা হলো। তার মতে, বিপ্লবের আগে জীবনযাপন আরো ভালো ছিল। তিনি বলেন, "এখনকার চেয়ে তখনকার দৈনন্দিন ব্যয় আরো কম ছিল।" তিনি আমাদেরকে জানান, একটিমাত্র রুমে স্ত্রী ও নয়জন সন্তান নিয়ে তিনি থাকেন। তারপরও ভাড়া পরিশোধ করতে তার হিমশিম খেতে হয়।

পাশেই কথা হলো আলী নামের আরেকজন ফলবিক্রেতার সাথে। বুআজিজি'র মতো তারও কোনো ব্যবসায়িক লাইসেন্স নেই। তিনি ভ্যানে করে তরমুজ, ডুমুর ও লেবু বিক্রি করেন। আমরা তার কাছে জানতে চাইলাম, জীবনযাত্রার কোনো উন্নতি হয়েছে কি না? তার জবাব ছিল, "বলে কী লাভ! কেউ তো শোনে না!"

আলীর কাছ থেকে আরো জানা গেলো, তার মতো ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা নিজেদের ভ্যানেই রাত্রিযাপন করে। বিপ্লবের আগেই অবস্থা আরো ভালো ছিলো বলে তিনিও মন্তব্য করেন।

সিদি বুজিদের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য নওফেল আল জামালী তরুণদের বেকারত্বকে বড় ধরনের সমস্যা হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে বলেন,

> "এই সমস্যাগুলো নিয়ে আমরা পাঁচ বছর আগেও কথা বলেছি। কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। জনগণ এখনো অপেক্ষা করে আছে, সরকার তাদের সকল স্বপ্ন

> পূরণ করে দেবে। তরুণদের জন্য এখানে কোনো সুযোগ-সুবিধা নেই। ভবিষ্যতের ব্যাপারেও তারা নিরাশ। ফলে তাদের সন্ত্রাসের পথে ঝুঁকে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।"

জাতীয় ঐক্য গঠন এবং আত্মপরিচয়ের রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রে রাজনীতিবিদরা অগ্রগতি সাধন করলেও দেশের অর্থনৈতিক ভবিষ্যত এখনো অনিশ্চিত। ঘানুশী এবং এসেবসির মতো নেতৃবৃন্দকে সস্তা প্রশংসার বন্যায় ভাসিয়ে দিলেও পাশ্চাত্য এখন পর্যন্ত কোনো অর্থসহায়তা নিয়ে আসেনি। এ প্রসঙ্গে ঘানুশীর বক্তব্য হলো,

> "আমার ধারণা, গণতন্ত্রের প্রশ্নে পাশ্চাত্য তিউনিশিয়ার চেয়ে পূর্ব ইউরোপকে বেশি সহায়তা করেছে। অথচ দায়েশ থেকে ইউরোপকে রক্ষায় তিউনিশিয়া সুরক্ষাদূর্গ হিসেবে কাজ করছে। দায়েশ তিউনিশিয়ার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিতে পারলে ইউরোপ সত্যিকারের হুমকির মধ্যে পড়ে যাবে। লিবিয়ার ক্ষেত্রে আমরা যেমনটা দেখছি।"

তার এ যুক্তি এখন পর্যন্ত পাশ্চাত্যের সরকারগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। তিউনিশিয়ার মতো যেসব দেশ নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করতে চায়, পাশ্চাত্য তাদেরকে সমর্থন করার চেয়ে বরং ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসেবে দেখার অপেক্ষায়ই থাকে।

অনুবাদ: আইয়ুব আলী

নতুন আন নাহদা কি একটি সেকুলার দল?

মুহাম্মদ আফফান

[তিউনিশিয়ার রাজনৈতিক দল আন নাহদার সাম্প্রতিক পরিবর্তন নিয়ে তুরস্কভিত্তিক থিংকট্যাংক আল-শার্ক ফোরামের ট্রেনিং ডিরেক্টর মুহাম্মদ আফফান এই বিশ্লেষণ করেছেন। - সম্পাদক]

আন নাহদা আন্দোলন সম্প্রতি তাদের দশম কংগ্রেসে ঘোষণা দিয়েছে, তারা 'রাজনৈতিক' কর্মকাণ্ড থেকে 'ধর্মীয়' কাজকে পৃথক করবে। পাশাপাশি নিজেদেরকে একটি গণতান্ত্রিক দলে রূপান্তর করবে।

আদর্শগত দিক থেকে এই সিদ্ধান্তের মানে দাঁড়ায়, আত্মপরিচয়ের রাজনীতি এবং প্যান-ইসলামিক এজেন্ডা থেকে আন্দোলনটি মূলত সরে আসছে। আর সাংগঠনিক দিক থেকে এর তাৎপর্য হলো, ইসলামী আন্দোলনের গতানুগতিক কম্প্রেহেনসিভ সংগঠনব্যবস্থাকে আন নাহদা পরিত্যাগ করেছে।

এরইসাথে মুসলিম ব্রাডারহুডের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করাকেও তারা গুরুত্বপূর্ণ মনে করছে না। এমনকি সম্পর্ক ছিন্ন করছে।

আন্দোলনটির এই 'নতুন পরিচয়' রাজনীতির মাঠে সম্ভবত ইতিবাচক ভূমিকাই রাখবে। স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রেও এটি কাজে দেবে। তা সত্ত্বেও নতুন সদস্য সংগ্রহ ও গতিশীলতা বজায় রাখার সক্ষমতা এবং অভ্যন্তরীণ ঐক্য ও স্থিতিশীলতার প্রশ্নে আন্দোলনটি কিছু চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়তে পারে। - সম্পাদক]

'ইসলামপন্থার দিন শেষ![১], 'রাজনৈতিক ইসলাম থেকে বেরিয়ে আসলো আন নাহদা'[২], 'রাজনৈতিক ইসলাম ছেড়ে মুসলিম ডেমোক্র্যাট হিসেবে যাত্রা'[৩] – এমনসব নাটকীয় ও চটকদার শিরোনাম দিয়ে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম গত ২০ মে অনুষ্ঠিত আন নাহদার দশম জাতীয় কংগ্রেসের খবর তুলে ধরেছে। এই কংগ্রেসে 'ধর্মীয় কাজ' থেকে 'রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের' পৃথকীকরণ এবং আন নাহদাকে একটি নিছক জাতীয় পর্যায়ের গণতান্ত্রিক দল[৪] হিসেবে রূপান্তরের ঘোষণা দেয়া হয়। এই ঘোষণাকে আন নাহদার আদর্শিক পরিবর্তন কিংবা আন্দোলনটির 'নতুন পরিচয়' (rebranding) হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

আন নাহদার প্রতিষ্ঠাতা, প্রধান তাত্ত্বিক ও বর্তমান সভাপতি রশিদ ঘানুশী মনে করছেন, এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত দলটির দূরদর্শিতারই[৫] পরিচায়ক। অন্যদিকে, এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সমালোচনার তীব্র ঝড় বয়ে যাচ্ছে। দলটির নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, তারা তাদের ইতিহাস ও মূল্যবোধের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। তিউনিশীয় সেকুলার এবং বৈশ্বিক মোড়লদের খুশি করতেই এ ধরনের লজ্জাজনক সমঝোতা করা হয়েছে।[৬]

এই সিদ্ধান্তের প্রশংসা কিংবা সমালোচনা – কোনোটিই এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। আমরা বরং বুঝতে চেষ্টা করবো, সিদ্ধান্তটির প্রকৃত তাৎপর্য কী এবং আন নাহদার রাজনৈতিক ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে এর সম্ভাব্য প্রভাবগুলো কী হতে পারে। তবে মূল আলোচনা শুরুর আগে সমসাময়িক ইসলামী আন্দোলনগুলোর রাজনীতি ও ধর্মের

---

১ http://www.nytimes.com/2016/06/03/opinion/tunisias-new-revolution.html (accessed: 5 Jun. 2016)

২ http://www.ansamed.info/ansamed/en/news/sections/politics/2016/05/19/tunisia-gannouchi-ennhadha-out-of-political-islam_1186d693-0121-47bf-8211-886b50b9caf8.html (accessed: 6 Jun. 2016)

৩ https://www.foreignaffairs.com/articles/tunisia/2016-06-08/political-islam-muslim-democracy (accessed: 5 Jun. 2016)

৪ http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/05/tunisia-ennahda-islamist-party-rebranding-congress.html (accessed: 5 Jun. 2016)

৫ Anadolu Agency http://goo.gl/QgrPpp (accessed:5 Jun. 2016)

৬ Azzam Tamimi, Article: Revisiting the separation between the political and the preaching, Arabi 21 (accessed: 5 Jun. 2016) http://goo.gl/x3c03p

মধ্যকার উভয়সংকটের শেকড় চিহ্নিত করা গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য আন নাহদা সর্বশেষ কংগ্রেসে এই উভয়সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে বলেই দাবি করছে।

কম্প্রেহেনসিভ ইসলাম, কম্প্রেহেনসিভ ইসলামী আন্দোলন

ইসলামের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যের আলোকে ইসলামী আন্দোলনের দিক থেকে রাজনীতি ও ধর্মের মধ্যকার সংকটপূর্ণ সম্পর্ক কিংবা রাজনীতি ও ধর্মের দ্বি-বিভাজনকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব – এমনটি কেউ বলতেই পারেন। সাধারণত বলা হয়ে থাকে, ইসলাম হলো 'একটি রাজনৈতিক ধর্ম', যেহেতু এটি একটি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবেই উৎপত্তি লাভ করেছে। একইসাথে এটি একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী ও সমাজ হিসেবে বিকশিত হয়েছে।[৭] তবে এই নিবন্ধে আমরা মনে করছি, ধর্ম ও রাজনীতির এই সংকটপূর্ণ সম্পর্ক একটি আধুনিক ব্যাপার, যা সমসাময়িক ইসলামী আন্দোলনগুলোর সাথে সম্পর্কিত। ইসলামের সামগ্রিকতা সম্পর্কে হাসান আল বান্নার একটি ক্লাসিক সংজ্ঞা থেকে এই সংকটের উৎপত্তি হয়েছে। তার বিখ্যাত উক্তিগুলোর মধ্যে এটি একটি, যেখানে তিনি বিস্তারিতভাবে বলেছেন,

> "ইসলাম হলো একটি সামগ্রিক ব্যবস্থা, যা জীবনের সকল দিকের সাথেই সম্পর্কিত। এটি একইসাথে দেশ ও মাতৃভূমি এবং সরকার ও বিশ্বব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত। এটি একইসাথে নৈতিকতা ও ক্ষমতা এবং মহানুভবতা ও ন্যায়পরায়ণতার কথা বলে। এটি একইসাথে সংস্কৃতি ও আইন এবং প্রজ্ঞা ও বিচারব্যবস্থার ভিত্তি। এটি বস্তুগত উপাদান ও সম্পদ অর্জনকে অনুমোদন করে এবং উন্নতি ও অগ্রগতির কথাও বলে। এটি একইসাথে জিহাদ ও দাওয়াহ এবং সামরিক ও আদর্শিক ব্যবস্থা। ইসলামই হলো জীবনবোধ ও ইবাদতের সামগ্রিক ও সঠিক পদ্ধতি।"[৮]

এই সংজ্ঞায় ধর্মের উপর স্পষ্টতই অতিরিক্ত গুরুত্বারোপ এবং স্বাভাবিক সমাজ কাঠামো ও রীতিনীতির উপর এক ধরনের ধর্মীয় পবিত্রীকরণের প্রচেষ্টা শুধু বিভ্রান্তিকরই নয়, বরং ইসলামের সামগ্রিক রূপকে হাসান আল বান্না যেভাবে একটি সামগ্রিক আন্দোলনের আদলে তুলে ধরেছেন, তাও যথেষ্ট বিভ্রান্তিকর।

---

[৭] Olivier Roy (trans. by Carol Volk), The Failure of Political Islam (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2001), 12.

[৮] Ana Belén Soage, "Hasan al-Banna And Sayyid Qutb: Continuity or Rupture?" The Muslim World, 99 (2009): 296.

'কোরআনের পতাকাতলে মুসলিম ব্রাদারহুড' শিরোনামের একটি বুকলেটে বান্না লিখেছেন, "আমরা কোনো রাজনৈতিক দল নই, যদিও ইসলামের মৌলিক শিক্ষার আলোকে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক ভাবনা আমাদের চিন্তাধারার কেন্দ্রবিন্দু। আমরা কোনো সমাজসেবামূলক সংস্থা নই, যদিও সেবামূলক কর্মকাণ্ড আমাদের অন্যতম বড় উদ্দেশ্য। আমরা কোনো ক্রীড়া দল নই, যদিও শারীরিক ও আধ্যাত্মিক ক্রীড়া আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। আমরা এসব সংগঠনের কোনোটিই নই।"[৯] এর পরিবর্তে হাসান আল বান্না মুসলিম ব্রাদারহুডকে একইসাথে "একটি সালাফী দাওয়াতী ধারা, সুন্নী মাজহাব, সুফী বাস্তবতা, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, ক্রীড়া দল, সাংস্কৃতিক সংগঠন, অর্থনৈতিক কোম্পানি এবং একটি সামাজিক ধারণা" হিসেবে সংজ্ঞায়িত করতে চান।[১০]

ইউটোপীয় রাজনৈতিক ভাবাদর্শ এবং সামাজিক সংগঠনের ক্ষেত্রে এই ভাবাদর্শের সর্বাত্মকবাদী মডেল দ্বারা হাসান আল বান্না স্পষ্টতই প্রভাবিত ছিলেন। ১৯৩০-৪০ এর দশকে এগুলো খুবই জনপ্রিয় ছিল। তবে সমাজসেবা ও ধর্মীয় দাওয়াতী কার্যক্রমের মাধ্যমে সামাজিক সংস্কার সাধনকে প্রাধান্য দিলেও চল্লিশের দশকের শুরুর দিকে হাসান আল বান্না দুইটি তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছেলেন –

এক) তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেলেন মুসলিম ব্রাদারহুড 'দলীয় রাজনীতি'তে জড়িত হবে। এই সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় ব্রাদারহুড ১৯৪১ এবং ১৯৪৫ সালের সংসদীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে।

দুই) তিনি ব্রাদারহুডের স্বশস্ত্র শাখা প্রতিষ্ঠা করেন (যা Secret Apparatus নামে পরিচিত)। এটি শুধু উপনিবেশিক শক্তি ও ফিলিস্তিনের ইহুদীবাদীদের বিরুদ্ধেই নয়, মিশরে ব্রাদারহুডের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধেও সহিংসতায় জড়িয়ে পড়েছিল।[১১]

---

[৯] Hassan al-Bannā, "Resālat al-ikhwān al-muslimoun tahat rāiat al-qur'ān" in Majmu'at rasa'il al-shahid Hassan al-Bannā (Alexandria, dār alda'wah lil-tebā'ah wa al-tawzi'wa al-nashr, 1990), 121.

[১০] Nazih Ayub, Political Islam: Religion and Politics in the Arab World (London: Routledge, 1991), 100.

[১১] Kristen Stilt, "Islam is the Solution: Constitutional Visions of the Egyptian Muslim Brotherhood", Texas International Law Journal 46 (2010):77.

তখন থেকেই ইসলামী আন্দোলনের মাঝে 'রাজনৈতিক' তথা পার্টিজান দৃষ্টিভঙ্গির সাথে 'দাওয়াতী' কাজের দৃষ্টিভঙ্গির এক ধরনের জটিল সম্পর্ক তৈরি হয়। কারণ, এই দুটি ধারার উভয়টিরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সংগঠন ব্যবস্থা, সদস্য সংগ্রহ ও সদস্যপদ প্রদানের পদ্ধতি, কার্যক্রম, বক্তব্য এবং উদ্দেশ্য রয়েছে। ইসলামী আন্দোলনগুলোর এ ধরনের হাইব্রিড বৈশিষ্ট্যের কারণে অনেক অসুবিধা তৈরি হয়েছে। যেমন – পেশাদারিত্বের অভাব, প্রশ্নবিদ্ধ ডিসকোর্স, অস্পষ্ট কৌশল গ্রহণ ইত্যাদি। অন্যদিকে, ইসলামী আন্দোলনের এই সর্বাত্মকবাদী ফর্মুলা সদস্য সংগ্রহ এবং রিসোর্সের গতিশীলতার মতো নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে খুব কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। এ ধরনের ইতিবাচক দিকগুলো ইসলামী আন্দোলনের হাইব্রিড বৈশিষ্ট্যের অসুবিধাগুলোকে আড়াল করে দিয়েছে। ফলত ইসলামী আন্দোলনগুলো সাফল্যের এক ধরনের মেকি অনুভূতি এবং আত্মতুষ্টিতে ভুগছে।

আরব বসন্তের পর স্বল্পকালীন ক্ষমতার অভিজ্ঞতা থেকে আন নাহদা একটি সামগ্রিক আন্দোলন হিসেবে চলার সীমাবদ্ধতাগুলো বুঝতে পেরেছে বলেই মনে হচ্ছে। তাই তারা আরো বেশি বিশেষায়িতকরণের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে তিউনিশিয়ার ইসলামী আন্দোলনের বিবর্তনের দীর্ঘ পরিক্রমার আপাত সমাপ্তি ঘটেছে।

আন নাহদার আদর্শিক ও সাংগঠনিক বিবর্তন

আন নাহদার দশম কংগ্রেসে রশিদ ঘানুশী তার মূল বক্তব্যে আন্দোলনটির বিবর্তনের তিনটি ধারাবাহিক পর্যায়ের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন:

> "সত্তরের দশক থেকেই আন নাহদার বিবর্তন শুরু হয়। শুরুতে ছিল একটি আদর্শিক আন্দোলন হিসেবে আত্মপরিচয়ের সংগ্রাম, তারপর স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে একটি সর্বাত্মক প্রতিরোধ আন্দোলন এবং সর্বশেষ সংস্কার প্রচেষ্টায় আন্তরিক একটি জাতীয় গণতান্ত্রিক দল হিসেবে আবির্ভাব।"[১২]

আর সাংগঠিক বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হলো – ১৯৭২ সালে 'ইসলামী দল' (আল জামায়াহ আল ইসলামিয়্যাহ) নাম দিয়ে তিউনিশিয়ায় প্রথম ইসলামী আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর ১৯৮১ সালে এটি 'ইসলামী ধারার আন্দোলনে' (হারাকাত

---

১২ http://www.aljazeera.com/news/2016/05/tunisia-ennahda-distances-political-islam-160520172957296.html (accessed: 6 Jun. 2016)

আল ইতিজাহ আল ইসলামী) পরিণত হয়। সর্বশেষ, ১৯৮৯ সালে এটি 'রেনেসাঁ আন্দোলনে' (হারাকাত আন নাহদা) পরিণত হয়।[১৩]

মোটাদাগে, এই তিনটি সংগঠন ইসলামী আদর্শের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ধরনকে ধারণ করে। প্রথম দলটি ছিল পুরোপুরি একটি ধর্মীয় আন্দোলন। তারা মসজিদগুলোতে ইসলামী আদর্শের প্রচার করতো। 'আল মারিফা' (জ্ঞান) নামে একটি ম্যাগাজিন প্রকাশ করতো। পরিবার ও শিক্ষা ইত্যাদি সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়গুলো ছিল এর বিষয়বস্তু। এছাড়া আন্দোলনটির তরুণদেরকে তারা ইসলামী নৈতিকতা শিক্ষা দিতো।[১৪]

১৯৮১ সালের ৬ জুন এটি 'ইসলামী ধারার আন্দোলন' হিসেবে যাত্রা শুরু করে। নতুন সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাকালীন দলিলপত্র অনুযায়ী এর মধ্যে রাজনৈতিক ইসলামী আন্দোলনগুলোর চারটি গতানুগতিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়:

১) সংগঠনটি ধর্ম ও রাজনীতিকে অবিচ্ছেদ্য দুটি সত্ত্বা হিসেবে বিবেচনা করে। ইসলামের সামগ্রিক রূপকে গ্রহণ করার ঘোষণা দেয়। সেকুলারিজম এবং প্রাগম্যাটিজম হতে মুক্ত থেকে রাজনীতি করার ব্যাপারে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকে। ধর্ম ও রাজনীতির পৃথকীকরণের চিন্তাকে তারা খ্রিস্টীয় ধারণার অনুপ্রবেশ এবং 'আধুনিকতা'র নেতিবাচক প্রবণতা হিসেবে সাব্যস্ত করে।

২) এই সংগঠন আত্মপরিচয়ের রাজনীতির উপর গুরুত্বারোপ করে। এ জন্য তারা দুটি কাজকে প্রাধান্য দেয়: তিউনিশীয় ইসলামী ব্যক্তিত্বদের যথাযথ মূল্যায়ন এবং ইসলামী চিন্তার সংস্কার।

৩) 'স্থানীয়, আঞ্চলিক, আরব বিশ্ব এবং আন্তর্জাতিক অর্থাৎ সকল পর্যায়ে ইসলামের রাজনৈতিক ও সামাজিক উপাদানগুলোকে ফিরিয়ে আনার তৎপরতা'য় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তারা স্পষ্টতই প্যান-ইসলামী ভাবাদর্শকে গ্রহণ করেছে।

৪) লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংগঠনটি ধর্ম ও রাজনীতির এক ধরনের মিশ্র পদ্ধতি ব্যবহার করে। এরমধ্যে রয়েছে 'ইবাদত ও জনসমাগমের কেন্দ্র হিসেবে'

---

[১৩] Alaya Allani, "The Islamists in Tunisia between confrontation and participation: 1980–2008", The Journal of North African Studies, 14:2 (2009): 258.

[১৪] Ibid, 259 – 260

> মসজিদের প্রকৃত ভূমিকা ফিরিয়ে আনা, ইসলামী ভাবধারাসম্পন্ন সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের সূচনা করা, স্বৈরতন্ত্রকে প্রতিরোধ করা, ইসলামী সরকারব্যবস্থার আধুনিক মডেল উপস্থাপন এবং এর উন্নয়ন সাধন করা, ইসলামের সামাজিক মূলনীতিগুলোর উন্নয়ন ও প্রয়োগ ইত্যাদি।[১৫]

'ইসলামী ধারার আন্দোলন'টি ১৯৮৯ সালে 'আন নাহদা মুভমেন্ট পার্টি' নাম নিয়ে নতুনভাবে কাজ শুরু করে। এর পেছনে একটা প্রেক্ষাপট রয়েছে। ১৯৮৭ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হাবিব বুরগিবাকে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে হঠিয়ে ক্ষমতায় আসেন যাইন আল আবেদিন বেন আলী। তার সময়ের গণমুখী রাজনীতির সুযোগ গ্রহণ করা ছিল এই পরিবর্তনের উদ্দেশ্য। বেন আলী শুরুর দিকে গণতান্ত্রিক রূপান্তর এবং একটি বহুত্ববাদী রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল নিজের ক্ষমতার বৈধতাকে আরো শক্তপোক্ত করা।

পরবর্তীতে তিনি এই প্রতিশ্রুতি আর রক্ষা করেননি। নয়া সরকারকে আশ্বস্ত রাখা এবং এবং রাজনৈতিক দল সংক্রান্ত তিউনিশিয়ার নতুন আইন অনুযায়ী (যে আইনে ধর্মীয় দলগুলোকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে) নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা তখন প্রয়োজনীয় ছিল। তাই ঘানুশী এবং ইসলামপন্থী অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সংগঠনের নাম পরিবর্তন, নাম থেকে 'ইসলামী' শব্দটি বাদ দেয়া এবং সংগঠনের আদর্শের পুনর্মূল্যায়ন করার সিদ্ধান্ত নেন। ফলে নতুন নাম হয় 'আন নাহদা মুভমেন্ট'। এই প্রেক্ষাপটে দাবি করা হয়েছিল, রাজনৈতিক ইসলাম সম্পর্কে ক্লাসিকাল ইসলামী আন্দোলনগুলোর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে তিউনিশিয়ার ইসলামী আন্দোলনের জন্য আন নাহদা নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দিয়েছে।[১৬]

বাস্তবতা হলো, মুসলিম ব্রাদারহুডের সাথে আন নাহদার সম্পর্ক কিছুটা জটিল। আন নাহদার প্রতিষ্ঠাতাদ্বয় (রশিদ ঘানুশী এবং আব্দুল ফাত্তাহ মুরো) যে মুসলিম ব্রাদারহুডের তাত্ত্বিকদের (হাসান আল বান্না এবং সাইয়েদ কুতুব) দ্বারা বেশ প্রভাবিত, তা নিয়ে সন্দেহ নেই। তবে তারা ব্রাদারহুড মতাদর্শের একটি উদার ভার্শনকে গ্রহণ করেছেন এবং এর সাথে অন্যান্য বুদ্ধিবৃত্তিক ধারার সমন্বয় ঘটিয়েছেন।

---

[১৫] Rachid al-Ghannoshi, min tajrebat al-harakaal-islamiah fi tunis, (Maghreb centre for research & translation, London: 1999), 285 – 290.

[১৬] Azmi Beshara, al-thawrq al-tunisiah al-majedah (Arab Center for Research & Policy Studies, Doha: 2012), 173 – 174.

এসব ধারার মধ্যে রয়েছে তিউনিশিয়ার চিরাচরিত সংস্কারবাদী ধারা, শিয়া রাজনৈতিক ইসলামের তাত্ত্বিকগণ (খোমেনী, বাকের আল-সদর, আলী শরিয়তী প্রমুখ) এবং পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক মতাদর্শসমূহ।[১৭] মুসলিম ব্রাদারহুড এবং আন নাহদার মধ্যকার সাংগঠনিক সম্পর্কের ব্যাপারে বলতে হয়, আন নাহদা যে ব্রাদারহুডের আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের একটি অংশ ছিল, তা প্রতিষ্ঠিত বাস্তবতা। সম্পর্ক যদিও বেশ শিথিল এবং ততটা কার্যকর ছিল না।[১৮]

নিছক ধর্মীয় একটি গ্রুপ থেকে প্রচলিত রাজনৈতিক ইসলামী আন্দোলন হিসেবে আত্মপ্রকাশ এবং পরবর্তীতে একটি উদার ইসলামপন্থী দল হিসেবে নিজেদের রূপান্তর – বিবর্তনের এই দুটি ঐতিহাসিক ধাপ পার হয়ে দলটি এখন নতুন আরেকটি ধাপে পা রাখতে যাচ্ছে।

সর্বশেষ কংগ্রেসের গৃহীত সিদ্ধান্ত আলোকে দলটিকে এখন সম্ভবত এমন একটি ইসলামপন্থা-উত্তর আন্দোলন হিসেবে অভিহিত করা যায়, যারা ইসলামকে অতি মাত্রায় রাজনৈতিকীকরণ এবং 'আদর্শিকীকরণ'কে এড়িয়ে চলে। একইসাথে যারা সমাজ জীবনের জন্য ধর্মকে একটি রেফারেন্স ও গাইডেন্স হিসেবে গ্রহণ করার মাধ্যমে ধর্মের সামাজিক ভূমিকাকে স্বীকার করে।

নতুন কাঠামো ... নতুন চিন্তাধারা?

'রাজনীতি' ও 'ধর্মীয় কাজের' পৃথকীকরণ এবং নিজেদেরকে একটি জাতীয় গণতান্ত্রিক দলে রূপান্তর করার যে সিদ্ধান্ত আন নাহদা নিয়েছে, তা আলোচনা-সমালোচনার ঝড় বইয়ে দিয়েছে। কিছু বিশ্লেষক এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছেন। তারা মনে করছেন, রাজনৈতিক অগ্রগতি ও আরো বেশি পেশাদারিত্ব অর্জনের পথে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। অন্যরা একে উদ্দেশ্যমূলক কর্মকৌশল এবং এক ধরনের লজ্জাজনক সমঝোতা হিসেবে দাবি করে এর সমালোচনা করছেন। কেউ বলছেন, এটি একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। আবার কারো মতে, আসলে এটি তেমন তাৎপর্যপূর্ণ কিছু নয়। বরং বাস্তব অবস্থা, বিশেষত আরব বসন্ত উত্তর পরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আন্দোলনটি এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

---

[১৭] Ibid, 173.

[১৮] Basheer Nafi, Article: Tunisia's Ennahda can change its discourse, but not the reality of political Islam", Middle East Eye http://www.middleeasteye.net/columns/tunisias-ennahda-can-change-its-discourse-not-reality-political-islam-1737542604 (accessed:6 Jun. 2016)

এই সমস্ত তর্ক-বিতর্কের মধ্য থেকে সিদ্ধান্তটির প্রকৃত মর্ম ও তাৎপর্য অনুধাবন করা সত্যিই অনেক কঠিন। তা সত্ত্বেও আন নাহদা নতুন কাঠামো ও নতুন চিন্তাধারার আলোকে নিজেদেরকে রিব্র্যান্ডিং করার চেষ্টা করছে বলেই মনে হচ্ছে।

আদর্শিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, আন নাহদা মূলত আত্মপরিচয়ের রাজনীতি পরিত্যাগ করে বাস্তব কর্মসূচিভিত্তিক রাজনীতি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সর্বশেষ কংগ্রেসে ঘানুশী তার বক্তব্যে বলেছেন, "নিছক মতাদর্শ, বড় বড় শ্লোগান আর রাজনৈতিক ঝগড়া-বিবাদ দিয়ে আধুনিক রাষ্ট্র চলে না। বাস্তব কর্মসূচির আলোকেই রাষ্ট্র চালাতে হয়।"[১৯] এর পাশাপাশি রাজনৈতিক ইসলামী আন্দোলনগুলোর প্রচলিত প্যান-ইসলামিক এজেন্ডা থেকে আন নাহদা সরে এসে শুধু জাতীয় এজেন্ডা অর্থাৎ তিউনিশিয়ার স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিয়োজিত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

কাঠামোগত অর্থে এই সিদ্ধান্তের মানে হলো, আন্দোলনটি একটি গতানুগতিক দলে পরিণত হবে এবং ধর্মীয় দাওয়াতী কার্যক্রম থেকে নিজেদেরকে গুটিয়ে নেবে। এ বিষয়টি নিশ্চিত করে ঘানুশী বলেন, "আমরা ধর্মকে রাজনৈতিক বিবাদ থেকে দূরে রাখতে চাই। রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব থেকে দূরত্ব বজায় রেখে, দলীয়করণ থেকে মুক্ত রেখে মসজিদগুলোর পূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য আমরা আহ্বান জানাই।"[২০] এই সিদ্ধান্তের আরেকটি তাৎপর্য হলো, মুসলিম ব্রাদারহুডের আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের অংশ হিসেবে আন নাহদার সাংগঠনিক সম্পর্ক পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন না হলেও অন্তত আগের চেয়ে তা আরো বেশি দুর্বল হয়ে পড়বে।

তবে আমি মনে করি, এই সিদ্ধান্তটি নিয়ে অতিরঞ্জন করার ফলে অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। আন নাহদার বিবর্তনের ইতিহাসের দিকে খেয়াল রাখলে দলটির আদর্শিক ও কাঠামোগত এই পরিবর্তনকে কোনোভাবেই আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত কিংবা চূড়ান্ত কোনো পরিবর্তন বলা যায় না। এমনকি, দলটির আদর্শ ও কাঠামো সেকুলার হয়ে গেলো, তাও নয়। কাঠামোগতভাবে, এটি নিছক 'কাজের সুবিধার্থে বিশেষায়িতকরণ', যেমনটি ঘানুশী ইতোমধ্যে স্পষ্টভাবেই বলেছেন।

বরং আদর্শের প্রশ্নে ঘানুশী তিউনিশিয়ার সেকুলার চরমপন্থীদের সমালোচনা করে দাবি করেছেন, "উন্নয়ন, কর্মতৎপরতা, ত্যাগ ও সত্যবাদিতায় উৎসাহ প্রদানের ক্ষেত্রে

[১৯] Official International Ennahda Page on Facebook (accessed: 5 Jun. 2016) https://www.facebook.com/Nahdha.International/posts/700729823363612

[২০] Ibid.

ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ISIS-সহ অন্যান্য চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ধর্ম আমাদের পক্ষের শক্তি। দেশের উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টাকেও ধর্ম সমর্থন করে।"[২১]

আন নাহদার রাজনৈতিক ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্তের প্রভাব কী হবে, সেটাই হলো সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। কেউ হয়তো বলবেন, আন নাহদা আরো বেশি পেশাদারিত্বের সাথে রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করতে সমর্থ হবে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আরো বেশি গ্রহণযোগ্যতা লাভ করবে।

যাই হোক, এসবের পাশাপাশি বেশকিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখিও যে হতে হবে, তা অনুমেয়। আত্মপরিচয়ের রাজনীতি এবং প্রচলিত রাজনৈতিক ইসলামপন্থী দলগুলোর সাংগঠনিক পদ্ধতি পরিত্যাগ করায় নতুন রিক্রুট ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে আন্দোলনটির সক্ষমতা এবং অভ্যন্তরীণ ঐক্য ও স্থিতিশীলতার নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

তাছাড়া ধর্মীয় দাওয়াতী কার্যক্রমের ব্যাপারটি আন নাহদা কীভাবে সুরাহা করবে, তাও একটা প্রশ্ন। আন্দোলনটি স্বয়ং এ জাতীয় কাজে আর সম্পৃক্ত হবে না, এটা পরিষ্কার। কিন্তু এর বিকল্প কী হবে? ধর্মীয় দাওয়াতী কাজের জন্য আন্দোলনটি কি ভিন্ন কোনো সংগঠন গড়ে তুলবে? কিংবা অন্ততপক্ষে এ জাতীয় সংগঠনকে সমর্থন করবে? নাকি এই ময়দান থেকে তারা নিজেদেরকে পুরোপুরি গুটিয়ে নেবে? যদি গুটিয়ে নেয়, তাহলে সৃষ্ট শূন্যতা কারা পূরণ করবে? কোনো ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা না হলে উগ্রধারার কোনো ইসলামী গ্রুপ এই সুযোগটা লুফে নিতে পারে এবং এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রটিতে নিজেদের বিস্তৃতি ঘটাতে পারে।[২২]

আদর্শিক ও সাংগঠনিক গতিশীলতা ধরে রাখা এবং দলটির বিকাশ ও নতুন পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করতে পারার সক্ষমতার আন নাহদা নিশ্চয়ই কৃতিত্বের দাবিদার। তাছাড়া দলটির সর্বশেষ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে চূড়ান্ত কিছু বলা এবং অত্র

---

[২১] Ibid.

[২২] Basheer Nafi, Article: Tunisia's Ennahda can change its discourse, but not the reality of political Islam", Middle East Eye discourse-not-r discourse-not-r http://www.middleeasteye.net/columns/tunisias-ennahda-can-change-its-eality-political-islam-1737542604(accessed:6June2016 . 2016)http://www.middleeasteye.net/columns/tunisias-ennahda-can-change-its-eality-political-islam-1737542604 (accessed:6 Jun. 2016)

অঞ্চলের রাজনৈতিক ইসলামী আন্দোলনগুলোর সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে এই সিদ্ধান্তের সম্ভাব্য ফলাফল বিচার করার সময় এখনো আসেনি।

অনুবাদ: আইয়ুব আলী

আন নাহদার দ্বিতীয় পর্যায়ে উত্তরণ

লারবি সাদিকী

[আরব বসন্তের সূতিকাগার তিউনিশিয়ার ইসলামপন্থী দল আন নাহদা। সম্প্রতি দলটি নিজেদের ধ্যানধারণার কিছু মৌলিক পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন এক সম্ভাবনার পথ দেখাচ্ছে। দলটির এই পরিবর্তন নিয়ে সংবাদ সংস্থা আল জাজিরার সহযোগী প্রতিষ্ঠান 'আল জাজিরা সেন্টার ফর স্টাডিজ' **Tunisia: Ennahda's 'Second Founding** শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

প্রতিবেনদটির লেখক লারবি সাদিকী কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক। ইসলামপন্থার নয়া গতিপথ সম্পর্কে বুঝাপড়ার কাজে এই প্রতিবেদনটি আশা করি সহায়ক হবে। - সম্পাদক]

[**সারসংক্ষেপ**: আন নাহদার পূর্বসূরী 'ইসলামিক টেনডেন্সি মুভমেন্ট' ১৯৮১ সালে আলোর মুখ দেখে। তিউনিশিয়ায় ফরাসীপ্রেমী শাসক বুরগিবার আমলের শেষের দিকে এ দলটির এজেন্ডা ছিলো দেশের ইসলামী পরিচয়কে সমুন্নত রাখা। যথাসম্ভব ইসলামী আইনের অনুসরণ করা, ইসলামী পরিচয়কে সমুন্নত রাখা এবং রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে ইসলাম নির্দেশিত পন্থার বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করা বলতে মুসলিম ব্রাদারহুডের তৎপরতাকেই সাধারণত বুঝায়। এই অর্থে ব্রাদারহুডের সাথে এ দলটির লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের তেমন পার্থক্য ছিল না।

২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত আন নাহদার দশম কংগ্রেসটি রাজনৈতিক ইতিহাসের খেরোখাতায় 'দ্বিতীয় পর্যায়' হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আন নাহদা তার অতীত অবস্থানকে অতিক্রম করে গিয়েছে। তবে রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় কার্যক্রমকে আলাদা করার পর তারা কীভাবে সামনে এগুবে, তা এখনো অস্পষ্ট। যাইহোক, আন নাহদা একটি উত্তরাদর্শিক পর্যায়ে (post-ideology phase) প্রবেশ করেছে। এটি সম্ভবত ইসলামপন্থার এক ধরনের 'উত্তরাধুনিক' পরিবর্তনের সূচনা। সত্যিই কি তাই?]

ভূমিকা

আন্দোলনের ঐতিহাসিক নেতৃবৃন্দের উপর আন নাহদার দশম কংগ্রেস পুনরায় আস্থা স্থাপন করেছে। দলটির নেতৃবৃন্দ ইসলামপন্থার যে 'তিউনিশীয় মডেল' আত্মস্থ করছেন – কিংবা অন্য কোনো কিছু – তার উপরও তারা আস্থা স্থাপন করেছে। যাইহোক, দলটি প্রচণ্ড ঝুঁকিতে আছে এবং সামনের প্রতিটি পদক্ষেপে চ্যালেঞ্জ ওত পেতে আছে। সংগঠন নাকি আদর্শ – এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে মরক্কো থেকে শুরু করে মিশর পর্যন্ত ইসলামপন্থীদের অভ্যন্তরীণ বিভাজনের পাশাপাশি একইভাবে সেকুলারদের মধ্যকার বিভাজনের এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ বর্তমানের এই সময়। এমতাবস্থায়, তিউনিশিয়ার ইসলামপন্থীরা মতাদর্শিক লড়াইয়ের চেয়ে ক্ষমতা অর্জনের লড়াইকে প্রাধান্য দিচ্ছে বলে মনে হয়। অর্থাৎ, পলিসিই মুখ্য, আদর্শ গৌণ ব্যাপার।

ইমাম হাসান আল বান্না, সাইয়েদ কুতুব, হাসান আল তুরাবি এবং ইমাম খোমেনী ও মুহাম্মদ হোসেন ফজলুল্লাহ (উভয়েই শিয়াদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা) প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় তাত্ত্বিকগণ তাদের লেখায় ইসলামকে ধর্ম ও রাজনীতির সমন্বয় (দ্বীন ওয়া দাওলাহ) হিসেবে ইসলামের যে তাত্ত্বিক কাঠামো দাঁড় করিয়েছিলেন, আন নাহদা কি একে 'হত্যা' করলো? ইসলাম ও রাজনীতির অবিচ্ছেদ্যতা একটি স্বতঃসিদ্ধ ধারণা হিসেবে প্রায় শতাব্দীকাল ধরে প্রতিষ্ঠিত। তিউনিশিয়ার ইসলামপন্থীরা এই ধারণাকে পুনর্বিবেচনা করছে বলে মনে হয়। এর আগে তাদের সমমনা মরক্কো ও তুরস্কের ইসলামপন্থীরাও এমনটি করেছে।

ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যকার যাবতীয় জটিলতার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পর ২০১৬ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত দশম কংগ্রেসে আন নাহদা এ সংক্রান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আন্দোলনটির ৩৬ বছরের ইতিহাসে সম্ভবত এটি একটি টার্নিং পয়েন্ট। এ ব্যাপারটিকেই আন নাহদার 'দ্বিতীয় পর্যায়' হিসেবে বলা হচ্ছে। এটা শুধু পরিকল্পিত কৌশল মাত্র নয়, সামাজিক বাস্তবতাও চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করবো।

আধুনিক রাজনৈতিক ইসলাম ও বাস্তব জ্ঞানের গুরুত্ব: কেন 'দ্বিতীয় পর্যায়'? তিনটি মুখ্য পর্যবেক্ষণ

(১) ধর্ম থেকে রাজনীতিকে পৃথকভাবে বিবেচনা করা, আরো সঠিকভাবে বললে, রাজনীতির উপর ধর্মের প্রভাবকে কমিয়ে আনা হলো মরক্কো ও তিউনিশিয়ার ইসলামপন্থীদের সাম্প্রতিক প্রবণতা। এটি এক অর্থে রাজনৈতিক ইসলামের ব্যর্থতা বটে। তারা আরব-ইসলামী পরিমণ্ডলে রাজনীতি ও সামাজিক বাস্তবতাকে মোকাবেলা করতে গিয়ে নিজেদের তাত্ত্বিক ধ্যানধারণা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে সফল হতে পারেনি।

যদিও এ ক্ষেত্রে দুয়েকটি ব্যতিক্রম রয়েছে। যেমন, তুরস্ক ও মালয়েশিয়া। দেশ দুটি খুব ভালো উদাহরণ না হলেও একেবারে মন্দও নয়।

(২) ইসলামপন্থীদের হাতে ধর্ম ও রাজনীতির এই বিভাজন তাদের আসল প্যারাডাইমকে দুর্বল করবে। তত্ত্বের চেয়ে বাস্তবতাকে গুরুত্ব দেয়ার বিষয়ে রাজনৈতিক ইসলামের এই নতুন ধারাটি অভিজ্ঞতার উপরই বেশি জোর দিয়ে নতুন তত্ত্ব নির্মাণের সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলছে। সম্ভবত রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও রাজনৈতিক ইসলাম এই ব্যাপারটা (ধর্ম ও রাজনীতির বিভাজন) মেনে চলবে। এর ফলে ধর্ম হিসেবে ইসলামের তাত্ত্বিক সম্ভাবনাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। এই নতুন তত্ত্ব গ্রহণ করলে ইসলামপন্থীদের রাজনৈতিক সংগঠনগুলো নিজেদের মধ্যে বাস্তব জ্ঞানের সমন্বয় ঘটাতে পারবে। এই 'বৈপরিত্বের' সমাধান করা আরব রাজনীতির জন্য বিরাট একটি চ্যালেঞ্জ। ইসলামী গণতন্ত্র বা শাসনব্যবস্থার অপরিহার্য ব্যাপার হিসেবে কোনো আদর্শ অবস্থাকে দাবি করা বেশ সহজ কাজ। যেমন, ইসলামপন্থী অনেক তাত্ত্বিক সামাজিক ন্যায়বিচার বা ইসলামের নৈতিক ভিত্তির শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলে থাকেন। কিন্তু বাস্তবে এগুলোকে অপরিহার্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা অনেক বড় চ্যালেঞ্জ।

(৩) ধর্ম ও রাজনীতির পৃথকীকরণের সাম্প্রতিক প্রবণতা সবার জন্য সমান সুযোগ তৈরির শুভ সূচনা করতে পারে। কোনো কিছুকে ইসলামের দৃষ্টিতে ভুলশুদ্ধ নির্ধারণের বিষয়ে প্রবল উৎসাহী কিছু মানুষ স্বঘোষিত ব্যাখ্যাদাতা বনে গেছেন। কেউই নিজেকে সর্বোচ্চ নৈতিকতাসম্পন্ন দাবি করার অধিকার রাখেন না এবং পাবলিক স্ফিয়ারে ধর্মের ভূমিকা কী হবে কিংবা হবে না, তা ঠিক করে দিতে পারেন না।

তিউনিশীয় প্রেক্ষাপট

ইসলামপন্থা নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে না। জন এসপজিটো, জন ভল[১] থেকে শুরু করে খালেদ আবু আল ফজলের[২] মতো স্কলারগণ ইতোমধ্যে একে স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার হিসেবে দেখিয়েছেন। বরং এ সময়কার ইস্যু হচ্ছে মুসলিম বিশ্বে সক্রিয় বিভিন্ন ধারার ইসলামপন্থা অনুসৃত ডগমার পুনর্মূল্যায়ন, কৌশলগত পরিবর্তন বিশ্লেষণ কিংবা পুরো বিষয়টির সূক্ষ্ম নিরীক্ষণ। ডেল অ্যাইকেলম্যান এবং জেমস পিসকাটরি মনে করেন, "মুসলিম রাজনীতি মূলত ধর্মীয় প্রতীকের ব্যাখ্যা এবং এগুলো প্রচার প্রসারের

[১] John L. Esposito & John O. Voll, Islam and Democracy (New York: Oxford University Press, 1996).

[২] Abou El Fadl, Khaled et al., Islam and the Challenge of Democracy (Princeton & Oxford: Princeton University Press, 2004).

কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত।" তাই বলা যায়, মুসলিম বিশ্বে বিদ্যমান ধর্মীয় ও জাগতিক ব্যাপারের মধ্যকার সদা পরিবর্তনশীল পারস্পরিক সম্পর্কের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণই হলো 'মুসলিম রাজনীতি'।

আরেকটু এগিয়ে তারা মতামত দেন, মুসলিম রাজনীতির চরিত্র ও সংগঠন ব্যবস্থা মিলে যে বক্তব্য তৈরি হয়েছে, অবশ্যই তা 'পুনর্বিবেচনা' করতে হবে। মুসলিম বিশ্বে এখন এক ধরনের আত্ম-উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এটি মুসলিম সম্প্রদায়কে কিছু মৌলিক প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। মোটাদাগে বলা যায়, মুসলিম বিশ্বে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের ফল হলো এ ধরনের উপলব্ধি।[৩] রাজনীতি, ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রকৃত তাৎপর্য কী, তা নিয়ে আরব বসন্তের অন্যান্য দেশগুলোর মতো তিউনিশিয়ার লোকজনের চিন্তার পালেও হাওয়া লেগেছে। এটা বহুত্ববাদ, জনগণের অংশগ্রহণ এবং স্বাধীনতার বহিঃপ্রকাশ।

যুগের চাহিদার আলোকেই রাজনৈতিক ইসলাম কিংবা ইসলামপন্থা নিজেকে নতুন করে গড়ে তুলছে। তিউনিশিয়ার ইসলামপন্থীরাও এর ব্যতিক্রম নয়। বর্তমানে ইসলামপন্থীরা কী ধরনের চিন্তাভাবনা করছে, বিশেষত মরক্কোর ইসলামপন্থীদের রেফারেন্স টেনে, সে সম্পর্কে আভি স্পিজেল তার সাম্প্রতিক বই 'ইয়ং মুসলিমে' কিছু পয়েন্ট তুলে ধরেছেন।[৪] 'মুসলিম রাজনীতির' বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অ্যাইকেলম্যান ও পিসকাটরির বই থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে স্পিজেল, বিশেষত তরুণ প্রজন্মের এক্টিভিস্টদের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে কার্যকর হয়ে ওঠা একটি পন্থা হিসেবে রাজনৈতিক ইসলামকে বিবেচনা করেছেন। ইসলামপন্থার এ দিকটি নিয়ে খুব কমই গবেষণা হয়েছে।

ইসলামপন্থার বিবর্তন প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ দুটি পয়েন্ট উল্লেখ করেছেন:

১. ইসলামপন্থীদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাহ্যিক ফ্যাক্টরগুলোর চেয়ে নিজেদের আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির ভূমিকা বেশি। তিউনিশিয়ার চেয়ে মরক্কোতে এটি বেশি লক্ষ্যণীয়। মরক্কোর ইসলামপন্থা অনেক বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ। রাজতান্ত্রিক এই

[৩] Dale Eickelman and James Piscatori, Muslim Politics (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1996).

[৪] Avi Max Spiegel, Young Islam: The New Politics of Religion in Morocco and the Arab World (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2015), pp. 177-178.

দেশটির জনপরিমণ্ডলে প্রভাব তৈরি করতে ক্ষমতাসীন ইসলামপন্থীরাসহ নানা ধরনের ইসলামপন্থীদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা চলছে।

অন্যদিকে তিউনিশিয়ায়, রাষ্ট্রের সাথে আন নাহদার সম্পর্কের ধরনই দলটির অভিমুখ নির্ণয়ে ভূমিকা রেখেছে। মরক্কোতে যা ঘটেনি বলে স্পিজেল মনে করেন। তিউনিশিয়ার ইসলামী ঐতিহ্য ও পরিচয়কে উপড়ে ফেলে বুরগিবার নেতৃত্বে এক ধরনের সেকুলার জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র ও জাতি গঠনের প্রচেষ্টার কারণে ইসলামপন্থীরা এর বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠে। এ বিষয়ে আন নাহদার বক্তব্য হলো, আত্মপরিচয়ের প্রশ্নে তিউনিশিয়ার জনগণ এখন আর বিভক্ত নয়। আগের নীতি থেকে আন নাহদার সরে আসার পেছনে আনসার আল শরীয়ার[৫] উগ্র কর্মকাণ্ডের (তিন বছর আগের তুলনায় গ্রুপটি এখন বেশ দুর্বল) ভূমিকা কতটুকু, তা অবশ্য স্পষ্ট নয়।

২. অদূর ভবিষ্যতে মরক্কোর জাস্টিস এন্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টিও (ফরাসীতে সংক্ষেপে দলটি PJD নামেই পরিচিত) সামাজিক-রাজনৈতিক কাজ (সিয়াসাহ) এবং ধর্মীয়-দাওয়াতী কাজের (দাওয়াহ) মধ্যে পৃথকীকরণের ব্যাপারটি ভেবে দেখতে পারে। আব্দুল আলী হামেদীনের দেওয়া উদাহরণের প্রসঙ্গ টেনে ধর্মীয় আন্দোলন (হারাকাত) ও রাজনৈতিক দলের (হিজব) মাঝে কী ধরনের বাস্তব পার্থক্য রয়েছে, স্পিজেল তা সুস্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন।[৬] বর্তমানে আন নাহদা এ পথেই এগুচ্ছে।

ইসলামপন্থা সম্পর্কে নতুন অনুসিদ্ধান্ত আন নাহদাকে তিউনিশিয়ার গণতান্ত্রিক সংস্কার পরবর্তী সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে আরো বেশি সুযোগ করে দিয়েছে। আন নাহদা এখন দেশটির সদ্য গড়ে ওঠা 'পাবলিক স্ফেয়ারের' অন্যতম অংশীদার। রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কাজকে দুটি পৃথক ধারায় আলাদা করলেও গণমুখী ইসলামপন্থা এ দুটির মাঝে এক ধরনের সমন্বয় করে চলছে।

এর পাশাপাশি নাগরিকদের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ, ক্ষমতার প্রতিযোগিতা, ২০১১ সাল থেকে জোটগতভাবে ক্ষমতার অভিজ্ঞতা এবং দলে পেশাদারিত্ব তৈরির লক্ষ্যে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণের মতো ব্যাপারগুলো তো রয়েছেই।

---

[৫] Aaron Y. Zelin, "Tunisia: Uncovering Ansar Al-Sharia," a policy analysis paper from The Washington Institute for Near East Policy, 25 October 2013, http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/tunisia-uncovering-ansar-al-sharia, Retrieved: 20/02/2016.

[৬] Ibid., p. 178.

তিউনিশিয়ার রাজনীতিতে ব্যাপক প্রভাবশালী হিসেবে সম্প্রতি পরিচিত হয়ে ওঠার পরও আন নাহদা দেশটির শক্তিশালী বামপন্থী ও সেকুলার শক্তির সাথে একত্রে কাজ করছে। সংলাপ ও ছাড় দেওয়া – উভয় অর্থেই আন নাহদা তাদের সাথে এনগেজ হয়েছে। এরমধ্যে ২০১১ সালে জোটগতভাবে ও বর্তমানে সেকুলারদের সাথে যৌথভাবে সরকার গঠন উল্লেখযোগ্য। মসজিদ শুধু ইবাদতের স্থান – এই ঘোষিত রাষ্ট্রীয় নীতিকে আন নাহদা ইতিবাচকভাবে মেনে নিয়েছে। ইমামদেরকে নতুন করে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং দায়িত্ব পালনে পেশাদারিত্ব তৈরির লক্ষ্যে বর্তমান রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনাকেও তারা সমর্থন করেছে।

বিশেষত তরুণ প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে পড়া ধর্মীয় উগ্রপন্থা এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের লড়াইয়ের প্রস্তুতির প্রেক্ষিতে এটা হয়তো আন নাহদার আত্মরক্ষামূলক কৌশলও হতে পারে।[৭] ইসলাম নিয়ে সক্রিয় মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন ব্যক্তি বা দল নিজেদেরকে ISIL-এর মতো গোষ্ঠীর বিরোধী হিসেবে পরিচয় দিচ্ছে। আন নাহদাও এর ব্যতিক্রম নয়। এটি 'মধ্যপন্থী' বনাম 'উগ্রপন্থীদের' দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ।

ইসলামের অপরিবর্তনীয় (আস সাবিত) ও পরিবর্তনীয় (আল মুতাগাইয়ির) নীতিকে বিবেচনায় নিলে আন নাহদা কর্তৃক রাষ্ট্রীয় বাস্তবতাকে মেনে নেয়ার ব্যাপারটি বুঝা যাবে। রাজনীতি হচ্ছে সদা পরিবর্তনশীল ব্যাপার। এক্ষেত্রে জনকল্যাণ তথা মাকাসিদই বিবেচ্য বলে আমি মনে করি। তিউনিশীয় প্রেক্ষাপটে, সেখানকার আবশ্যকতা ও প্রয়োজনীয়তাই আন নাহদার এই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রভাব রেখেছে।

তিউনিশিয়ার অভ্যন্তরীণ অবস্থার প্রেক্ষিতে অর্থাৎ, সমালোচকরা যে ধরনের সন্দেহ করছে তার জবাবই সম্ভবত আন নাহদা দিচ্ছে। সমালোচকদের সন্দেহ, দলটি তার গোপন ধর্মরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এজেন্ডাকে আড়াল করছে। তারা একবার ক্ষমতায় যেতে পারলেই স্বৈরতন্ত্র কায়েম করবে। আন নাহদা তিউনিশিয়ার রাজনৈতিক আত্মপরিচয়ের ব্যাপারে শ্রদ্ধাশীল নয় – লিবারেল ও সেকুলাররা যেন এমন সমালোচনা করতে না পারে, তাই আগে থেকেই দলটি পরিবর্তনের পথে হেঁটেছে। আন নাহদা এখন দাবি করতে পারে যে, তারা আত্মপরিচয়ের রাজনীতিতে পরিবর্তন এনেছে।

[৭] Rachid Khechana, "The thorns in the side of Tunisia's young democratic process," paper from the Aspen Institute, 25/04/2016, in: https://www.aspeninstitute.it/aspenia-online/article/thorns-side-tunisias-young-democratic-process, Retrieved: 26/05/2016.

২০১৬ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত দশম কংগ্রেসের ঘোষণা অনুযায়ী আন নাহদাকে নতুন পরিচয়ে পরিচিত করার পরিকল্পনাকে সংক্ষেপে এভাবে তুলে ধরা যায়:

আন নাহদা একটি সিভিল স্টেট (দাওলাহ মাদানিয়্যাহ) প্রতিষ্ঠায় সংকল্পবদ্ধ। এটি ইসলামপন্থীদের আগের অবস্থান – শরীয়াহ (ইসলামী আইন ব্যবস্থা) হবে রাষ্ট্রীয় আইন – থেকে সরে আসা। যেমন, ইমাম হাসান আল বান্না এই লক্ষ্যে কাজ করেছেন।

দলটি জাতীয় রাজনীতির খেলোয়াড় হিসেবে নিজের পরিচয় ঠিক করে নিয়েছে, অর্থাৎ ক্ষমতার অন্যান্য দাবিদার ও প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোর সাথে রাজনৈতিক ময়দানে তারা কাজ করবে। এর মাধ্যমে তারা ইসলামপন্থার পুনর্জাগরণবাদী ধারা থেকে বেরিয়ে এসেছে। 'ইসলামই হচ্ছে সমাধান' – মুসলিম ব্রাদারহুডের এই পুরনো দাবির কার্যকারিতা আর থাকলো না, যদিও আন নাহদা নিজেদের শ্লোগান হিসেবে এটি আসলে ব্যবহার করেনি।

আন নাহদা ইসলামপন্থাকে নিছক আদর্শ হিসেবে না দেখে কমবেশি এক ধরনের 'রাজনৈতিক নৈতিকতা' হিসেবে বিবেচনা করেছে, ক্ষমতার লড়াইয়ে যা চূড়ান্ত রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা দিবে। এই দিক থেকে বলতে গেলে আন নাহদা উত্তরাদর্শিক পর্যায়ের দিকে এগুচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে একে এক ধরনের 'আদর্শের সমাপ্তি' মুহূর্তও বলা যায়।

আন নাহদা বাজার অর্থনীতিকে গ্রহণ করে নিয়েছে। পুঁজিবাদ নিয়ে পূর্বেকার ইসলামপন্থীদের (এ ব্যাপারে সাইয়্যেদ কুতুব সবচেয়ে সোচ্চার ছিলেন। ইসলামের সামাজিক ন্যায়বিচার ছিল তার রাজনৈতিক চিন্তার মুখ্য বিষয়) মাঝে যেসব আপত্তি ছিলো, আন নাহদা তা থেকে সরে এসেছে। বিপ্লবের পর আন নাহদা সামাজিক ন্যায়বিচারকে গ্রহণ করে নিয়েছে।

সমাজের ৯৯ ভাগ মানুষই যেখানে সুন্নী মুসলমান, সেখানে সামাজিক পর্যায়ে মানুষকে নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়ার কাজ থেকে আন নাহদা ইস্তফা নিয়েছে। এর মাধ্যমে নতুন করে পেশাদারিত্বের ছবক নেয়া এ রাজনৈতিক দলটি দাওয়াতী কার্যক্রম থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। একইসাথে ধর্মীয় বিষয় ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কর্তৃত্বশীল ভূমিকা ও তা বাস্তবায়ন করার প্রচেষ্টা থেকেও সরে আসছে।

মুসলিম ব্রাদারহুডের মতো আন্দোলনগুলোকে যে সকল মৌলিক দাবির (যেমন– কোরআন আমাদের সংবিধান, জিহাদ আমাদের পথ) আলোকে চিহ্নিত করা যায়, আন নাহদা সেগুলো থেকে আলাদা। গুণগত (আদর্শিক) কিংবা ব্যবহারিক (রাজনৈতিক) কোনো অর্থেই আন নাহদাকে এসব আন্দোলনের সাথে মেলানো যায় না।

গণমুখীনতা

আলজেরিয়া, মিশর, লেবানন, মরক্কো এবং সুদানের ইসলামপন্থী দলগুলোর মতো আন নাহদাও 'সমাজের সাথে খাপ খাইয়ে চলার' অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। অতীতে ইসলামপন্থীরা ক্ষমতা বলয় থেকে দূরে থাকলেও বর্তমানে তারা সত্যিকারের ক্ষমতার মুখোমুখি হচ্ছে।[৮] তাই তাদের পলিসি ও রাজনৈতিক আচরণের সংস্কার নিছক কৌশলগত বা স্বল্পস্থায়ী ব্যাপার নাও হতে পারে। আন নাহদা ২০১৪ সালের সংসদীয় নির্বাচনের মতো সব সময় বিজয়ী হিসেবে না থাকলেও নির্দিষ্ট ভোটার, সদস্য ও শুভাকাঙ্খী থাকায় রাজনীতির মাঠে নিজেদের দৃশ্যমানতা ও প্রাধান্য বজায় থাকে। এ সময়ের মধ্যে দলটি যথেষ্ট সম্মান, মর্যাদা ও খ্যাতি অর্জন করেছে। তারা জানে সমাজের সাথে কীভাবে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয়। বিপ্লবের আগে দলটি স্বৈরশাসকের সকল প্রকার নির্যাতন ও নিবর্তনমূলক আচরণের শিকার হয়েছিল। এখন দলটির রাজনৈতিক ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটেছে। এর ফলে তারা বৈধভাবে কর্মকাণ্ড চালানো, রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্বীকৃতি লাভ, আইনী গ্রহণযোগ্যতাসহ যৌথভাবে ক্ষমতায় যাওয়ার সুযোগ অর্জন করেছে।

রাজনৈতিক ময়দানের একটি পক্ষ হিসেবে আন নাহদা এখন ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কার্যকর রাজনৈতিক কৌশল এবং সক্রিয় পাবলিক পলিসি প্লাটফর্ম তৈরির মাধ্যমে নিজেদের সক্ষমতা বৃদ্ধি নিয়ে ব্যস্ত। মতামর্শ তাদের গাইডিং ফোর্স হিসেবেই এখন সীমাবদ্ধ। যদিও দলটির অনেক সদস্য এবং বিশ্বব্যাপী ইসলামপন্থী সমাজের কাছে ধর্ম ও রাজনীতির এই বিভাজন এক ধরনের ধর্মচ্যুতিমূলক ব্যাপার বলে মনে হতে পারে।

ক্ষমতার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ক্ষমতা অর্জনের জন্য কীভাবে নমনীয় ভূমিকা পালন করতে হয়, মিশরে মুসলিম ব্রাদারহুড তা দেখিয়েছে। এগুলো সমাজের সাথে খাপ খাইয়ে চলার প্রথম দিকের উদাহরণ। মূলত আরব বসন্তের পর অধিকাংশ দেশে মুসলিম ব্রাদারহুড এক ধরনের পৃথকীকরণ করতে বাধ্য হয়েছে। মিশরীয় ব্রাদারহুড 'ফ্রিডম এন্ড জাস্টিস পার্টি' নামে একটি দল প্রতিষ্ঠা করেছে। কেউ ব্রাদারহুডের সদস্য হোক বা না হোক, সবার জন্যই দলটিতে যোগদানের সুযোগ রাখা হয়েছে। অন্তত তাত্ত্বিকভাবে হলেও দলটি সিভিল স্টেট ও রাজনৈতিক বহুত্ববাদকে মেনে নিয়েছে।

খাপ খাইয়ে নিতে পারাটা এক ধরনের সক্ষমতা। ক্রমাগত ঠেকে ঠেকে শেখার মাধ্যমে যথাসময়ে বহুত্ববাদ, স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক উত্তরণের দাবিগুলো বুঝতে পারাটা একটা

---

[৮] Emmanuel Sivan, "Why Radical Muslims Aren't Taking Over Governments," Middle East Review of International Affairs, Vol. 2, No. 2 (1998).

বিরাট চ্যালেঞ্জ। এটাই রাজনীতির কৌশল। সুস্পষ্ট বক্তব্য, আইনসম্মত ও গণতান্ত্রিক কৌশল অবলম্বন, অভিন্ন মূল্যবোধ এবং বহুদলীয় স্বার্থকে গুরুত্ব দেয়ার জন্য পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার একটা কমন জায়গা খুঁজে বের করাই হলো খাপ খাইয়ে চলার মূলকথা। এভাবেই হয়তো তিউনিশিয়ার ইসলামপন্থীরা বাস্তবিক অর্থেই 'ইসলামী গণতন্ত্র' (সমালোচকরা অবশ্য একে একটি পরস্পরবিরোধী ব্যাপার হিসেবে দাবি করে থাকে) প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে পারে।[৯] বাস্তবতা হলো, তথাকথিত 'আরব লিবারেলরা' নিজেরাই বিভাজনে লিপ্ত এবং তাদের নিজেদের সংস্কার প্রক্রিয়াও খুবই মন্থর।[১০] তাদের এই অবস্থা সম্ভবত ইসলামপন্থীদেরকে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকে পড়ার সুযোগ করে দেবে।

ধর্ম ও রাজনীতির পৃথকীকরণের ফলে বিভিন্ন ইস্যুতে আরো বেশি সংশ্লিষ্ট হতে পারার মাধ্যমে সমাজের সাথে খাপ খাইয়ে চলার যে নীতি, তা কি সমাজে উগ্রপন্থার জন্ম দেবে, নাকি উগ্রপন্থা রোধ করবে – এটি অবশ্য তর্কসাপেক্ষ ব্যাপার। এটা ঠিক যে, অন্যান্য অনেক আরব রাষ্ট্রের মতো তিউনিশিয়ার রাজনীতিতেও ধর্মের একটি ভূমিকা থাকার দাবিকে অগ্রাহ্য করা অসম্ভব। ইসলামপন্থার একটি শক্তিশালী স্তম্ভকে ছেড়ে দেয়াকে কেউ কেউ পিছু হঠা হিসেবে বিবেচনা করতে পারে। এমনটা হলে, এর পরিণতিতে উগ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হতে পারে।[১১] যাইহোক, কাণ্ডজ্ঞান থেকেই বলা যায়, সমাজের সাথে মানিয়ে চলার এই নীতি উগ্রপন্থা নয়, বরং মধ্যপন্থার অনুসরণ ও মতাদর্শকে কম গুরুত্ব দেয়াকেই নির্দেশ করে।

'নয়া আন নাহদা'?

যে 'ইসলামপন্থা' আন নাহদার অপরিহার্য ড্রকট্রিন, মৌলিক পরিচয়, সেই ইসলামপন্থাকে তারা কি পরিত্যাগ করছে? ১৯৭০ দশকের শেষ দিকে দলটি 'ইসলামিক টেনডেন্সি মুভমেন্ট' নামে যাত্রা শুরু করেছিল। তখন থেকে

[৯] Gudrun Krämer, "Islamist Notions of Democracy," Middle East Report, No. 183 (1993), pp. 2-8.

[১০] Jon Alterman, "The False Promise of Arab Liberals," Policy Review (June/July 2004).

[১১] Michael Georgy & Tom Perry, "Special report: As Brotherhood retreats, risks of extremism increase," Reuters, 28 October 2013, In: www.reuters.com/article/2013/10/28/us-egypt-brotherhood-special-report-idUSBRE99R0DU20131028, Retrieved: 21/03/2015.

আত্মপরিচয়ের রাজনীতি, আরো স্পষ্টভাবে বললে, রাজনীতি, সমাজ ও অর্থনীতি সম্পর্কে মৌল প্রস্তাবনা হিসেবে ইসলামের ধারণাগুলোকে প্রমোট করতে থাকে। আন্দোলনটির ঘোষিত পলিসি, কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা এবং রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা – সবকিছুই তাদের আত্মপরিচয়ের রাজনীতিকে স্পষ্ট করে তোলে।

নির্বাসন, কারাভোগ, নিষেধাজ্ঞাসহ অনেক ত্যাগের বিনিময়ে দলটিকে বর্তমান অবস্থান ও সমর্থন লাভ করতে হয়েছে। হাবিব বুরগিবা ও তার উত্তরসুরী পতিত স্বৈরশাসক জাইন আল আবেদীন বেন আলী উভয়ের শাসনামলেই দলটিকে এসব নির্যাতন সইতে হয়েছে। বেন আলীর সময়ে দলটি দেশের রাজনীতিতে অবস্থান তৈরি করে নেয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। ১৯৮০-র দশকের শেষ দিকে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দলটি ভোটারদের সমর্থন লাভের আগাম আভাসও দিয়েছে। এর প্রেক্ষিতে তৎকালীন স্বৈরশাসক রাজনৈতিক সহাবস্থানের নীতি থেকে সরে এসে দলটির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও দমনমূলক তৎপরতা শুরু করে। বেন আলীর পুলিশ বাহিনীর হাতে আন নাহদা যত নির্যাতন সয়েছে, তিউনিশিয়ার ইতিহাসে আর কোনো রাজনৈতিক দলকে এতো নির্যাতন সইতে হয়নি।

'নয়া আন নাহদার' তিন দিনব্যাপী ঐতিহাসিক কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। অত্যন্ত চমৎকার বিতর্ক হয়েছে সেখানে। আমি নিজে উপস্থিত থেকেও কিছু অংশ শুনেছি। মাঝেমধ্যে উত্তপ্ত বিতর্ক হলেও তা সহনশীল পর্যায়ে ছিল। এই কংগ্রেসে আন নাহদাকে একটি জাতীয় রাজনৈতিক দল হিসেবে নতুন করে দাঁড় করানো হয়েছে। ইসলাম হলো 'নয়া আন নাহদার' প্রেরণা (frame of reference)। আর গণতন্ত্র হলো রাজনৈতিক পদ্ধতি। কংগ্রেস শেষে 'নয়া আন নাহদা' তাই ধর্মীয় কাজ (দাওয়াহ) ও রাজনৈতিক তৎপরতার (আস সিয়াসাহ) মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ব্যক্ত করেছে।

একটি নতুন গণমুখী ইসলামপন্থার স্বার্থে তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে গড়ে তোলা ভিশনকে ত্যাগ করতে হয়েছে। নতুন আন নাহদা একটি সিভিল স্টেট ধারণার কাছাকাছিই শুধু নয়, বরং তুরস্কের একেপি মডেলেরও কাছাকাছি এবং মিশরের মুসলিম ব্রাদারহুড তথা 'ইখওয়ানী' মডেলকে ছাড়িয়ে গেছে। উল্লেখ্য, একেপি রাজনীতির ক্ষেত্রে মতাদর্শকে ন্যূনতম মাত্রায় বিবেচনায় রাখে। আর ঐতিহাসিকভাবেই ব্রাদারহুডের আকাঙ্ক্ষা হলো রাজনীতিকে ইসলামীকরণ করা।

এ কারণেই কংগ্রেসে দলটির প্রেসিডেন্ট শায়খ রশিদ ঘানুশী একটি নতুন ডিসকোর্স তুলে ধরেন। তিনি বাজার ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপর জোর দেন। অন্যদিকে

আত্মপরিচয়ের রাজনীতি (সিয়াসাহ আল হুয়িয়্যাহ) পরিত্যাগের ঘোষণা দেন, গত ত্রিশ বছর ধরে যা তার অন্যতম মৌলিক চিন্তা ছিল।

এর পেছনে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত তিনটি বিষয় কাজ করেছে বলে আমার ধারণা।

প্রথমত, তিউনিশিয়ার মতো একটি 'ডিপ স্টেটে' কাজ করার উপযোগী হিসেবে আন নাহদাকে গড়ে তোলা।

তিউনিশিয়ায় এখনো বুরগিবার ফরাসীপন্থী রাজনৈতিক কাঠামোর ছাপ রয়ে গেছে। অর্থাৎ, দেশটি ঐহিত্যগতভাবে সেকুলার। দেশটির সমাজও সেভাবেই গড়ে ওঠেছে। সেখানকার সমাজ এক জটিল আত্মপরিচয়কে ধারণ করে আছে। তারা ইসলামকে সম্মান করলেও রাজনীতিসহ যে কোনো সামষ্টিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অবাধ নাগরিক অংশগ্রহণ চায়। দিন শেষে আন নাহদাও বিচক্ষণতা ও দক্ষতার সাথে ব্যাপারটি খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে। ৩৫-৪০ শতাংশ ভোটারের সমর্থনপ্রাপ্ত একটি প্রধান রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে তারা 'তিউনিশীয়করণকে' নিজেদের পরিচয়ের জন্য বেছে নিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, দলের মাঝে পেশাদারিত্ব আনা।

যে কোনো দূরদর্শী রাজনৈতিক দলের জন্যই এটি প্রযোজ্য। তাই ধর্ম ও রাজনীতির পৃথকীকরণ ঘটিয়ে গৃহীত নতুন পরিচয় রক্ষার মাধ্যমে আন নাহদা একটি পরিপূর্ণ গণমুখী রাজনৈতিক দল হয়ে ওঠার পথে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ পার করছে। কংগ্রেসে উত্থাপিত সকল সংশোধনী পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে গৃহীত হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায়, কংগ্রেসের আগে টানা কয়েক মাস ধরে দলের অভ্যন্তরে চলা বিতর্কগুলোর ফলাফল সংস্কারপন্থীদের পুরোপুরি অনুকূলে এসেছে। এই সংশোধনীতে শুরা কাউন্সিলকে আরো বেশি ক্ষমতা প্রদানের বিষয়টিও রয়েছে।

প্রসঙ্গত, শুরা কাউন্সিলের ১০০ জন সদস্য কনফারেন্সেই সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। এরা আরো ৫০ জনকে মনোনীত করেন। আন নাহদার নেতৃত্বে গঠিত ত্রিপক্ষীয় সরকার ২০১৪ সালের শুরুতে দেশকে একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান উপহার দিয়েছিল। এই অভিজ্ঞতা দলটিকে অত্যন্ত মূল্যবান সক্ষমতা এনে দিয়েছে, যা আত্মপোলব্ধি, সংস্কার ও পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে তারা কাজে লাগিয়েছে।

তৃতীয়ত, 'বিভাজনের' হাত ধরে গণতন্ত্রায়ণ।

যে কোনো অভিজ্ঞ রাজনৈতিক দলের এটি একটি দারুণ বৈশিষ্ট্য। গত ২২ মে সকালে আন নাহদার ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একটি চমকপ্রদ বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রজন্মের প্রতিনিধি হিসেবে তিনজন নেতা সেদিন বিতর্কমঞ্চে

আসেন। দলকে কীভাবে সংগঠিত করা, নেতৃত্ব দেয়া ও পরিচালনা করা উচিত – সে ব্যাপারে তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ মতামতের পক্ষে নানা যুক্তিতর্ক তুলে ধরেন (এরচেয়ে বিস্তারিত জানানোর সুযোগ আমার নেই)।

বিপ্লবের আগে এ রকম কোনো কিছু অকল্পনীয় ছিল। আন নাহদার এ ধরনের অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চা এক প্রকার দলীয় কোন্দলের জন্ম দিয়েছে। দলের নীতিনির্ধারকদের হাতে থাকা বিপুল ক্ষমতার লাগাম টেনে ধরতে এ ধরনের মতবিরোধ সময়ের ব্যবধানে কাজে লাগে। আরব বিশ্বের সেকুলার দলগুলোর মতোই ইসলামপন্থী দলগুলোও দলীয় কাঠামোর গণতান্ত্রিক পরিবর্তন এবং অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চাকে ঠেকিয়ে রাখতে চায়। এই দৃষ্টিতে, বিভাজনকে অবশ্যই গণতন্ত্রায়নের ক্ষেত্রে – অন্তত দীর্ঘমেয়াদে হলেও – একটি পদক্ষেপ হিসেবে দেখা উচিত।

হাসান আল বান্নার ইসলামপন্থার পরিসমাপ্তি?

আরব বসন্তের পর রাজনৈতিক ইসলাম তথা ইসলামী আন্দোলনের অচলাবস্থা, সংকট ও ভাঙ্গনের যে ছায়া দেখা যাচ্ছে, এর জন্য দৃশ্যত কোন কারণটি সবচেয়ে বড় বলে মনে হয়? সেটা হলো 'ইসলামিক প্রজেক্ট' নিয়ে এক ধরনের কনফিউশন।

হাসান আল বান্নার সময় থেকেই এই কনফিউশন ছিল। মুসলিম ব্রাদারহুড নামে বান্না (১৯৪৯ সালে আততায়ীর হাতে নিহত) সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক আদর্শসম্পন্ন সংগঠনের একটি মডেল প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন। যাই হোক, মিশর থেকে শুরু করে করে তিউনিশিয়া পর্যন্ত এই কনফিউশনই পরিলক্ষিত হচ্ছে।

নৈতিক দৃষ্টিতে, আদর্শবাদীদের আশার আলো এখনো ফিকে হয়ে যায়নি। এখনো লক্ষ লক্ষ প্রান্তিক মানুষের জীবনে তা আলো ছড়াচ্ছে। বান্না এবং তার পরবর্তী সময়ে সাইয়েদ কুতুব (বিখ্যাত মিশরীয় তাত্ত্বিক ও স্কলার, ১৯৬৬ সালে জামাল নাসের তাকে ফাঁসি দেন) থেকে শুরু করে মাওলানা আবুল আলা মওদূদী (ইন্দো-পাক বংশোদ্ভূত শীর্ষস্থানীয় স্কলার, মৃত্যু: ১৯৭৯) পর্যন্ত সমমনা উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বগণ 'ইসলামী শাসনব্যবস্থার' সমর্থনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তাদের দৃষ্টিতে ইসলাম এমন একটি ব্যাপার, যা অতীত উপনিবেশের অধীন মানুষের কণ্ঠস্বরই শুধু নয়; দমনপীড়ন, পাশ্চাত্যকরণ, সেকুলারাইজেশন ও নৈতিক অবক্ষয় মোকাবেলার উপায়ও বটে। রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি ও নৈতিকতার ইঙ্গ-মার্কিন মডেলের সমাপ্তি ঘটানোর উপায়ও ইসলাম।

সাইয়েদ আবুল হাসান নদভীর বিখ্যাত 'ইসলাম ও বিশ্ব'[১২] বইয়ের জন্য লিখিত ছোট্ট কিন্তু অসাধারণ ভূমিকায় সাইয়েদ কুতুব ইসলাম সম্পর্কে লেখকের এই চিন্তাকে সমর্থন করেছেন – ইসলাম হলো 'কুসংস্কার', 'দাসত্ব' এবং ধর্মীয় ও রাজনৈতিক 'জুলুমবাজি' থেকে মুক্তির উপায়। সাইয়েদ কুতুবের বক্তব্য হচ্ছে, বিশ্বাস, জ্ঞান, ভ্রাতৃত্ববোধ, ন্যায় এবং আত্মবিশ্বাসের আলো ছড়িয়ে ইসলাম মানুষের জীবনকে মহিমান্বিত করে তোলে। এগুলো হচ্ছে সেই জীবনসঞ্চারী মূল্যবোধ, যা একটি 'ন্যায়সংগত, সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা' প্রতিষ্ঠা করার জন্য মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[১৩]

একটি 'ন্যায়' ও 'ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা' প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাওয়াই ইসলামের চূড়ান্ত লক্ষ্য। সামাজিক ন্যায়বিচারের মতো ন্যায় ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থাই কেবল আল্লাহ ও মানুষ, দুনিয়া ও পরকাল, মুসলিম ও অমুসলিম, সমাজ ও ব্যক্তি, তত্ত্ব ও বাস্তবতা প্রভৃতি আপাত দ্বান্দ্বিক সমস্যার সমাধান করতে পারে।

সাইয়েদ কুতুব তার উপরোক্ত কথাগুলো শুধু ধর্ম ও রাষ্ট্রব্যবস্থা (দ্বীন ওয়া দাওলাহ) হিসেবে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের প্রসঙ্গেই বলেননি। বরং কোনো বিষয়ে গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে কিংবা দুনিয়াবী নেতৃত্ব প্রসঙ্গেও তিনি এই কথার বাইরে যাননি। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, যেহেতু ইসলাম 'স্বকীয় বিশেষ বৈশিষ্ট্যের আলোকে জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের কথা বলে, তাই এগুলোর মধ্যে 'কল্যাণ' রয়েছে।[১৪] অন্যদের অনুসারণ নয়, বরং মুসলিমদের নেতৃত্বের মাধ্যমেই একটি ন্যায় ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ বা রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে – এ ব্যাপারে তার মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। নেতৃত্বকে ইসলামের একটি সহজাত ব্যাপার হিসেবেই তিনি বিবেচনা করেছেন। তিনি বরং জোর দিয়ে আরো বলেছেন, যখন কোনো দায়িত্ব (তথা নেতৃত্ব) কাঁধে থাকে, তখনই কেবল ইসলামের স্পিরিট 'যাচাই' ও 'পরীক্ষা' করা যায়। তার মতে, ইসলাম শুরু থেকেই এভাবে 'মানুষের জীবনের নেতৃত্ব দিতে এসেছে। অধীনস্ত হয়ে থাকা ইসলামের পক্ষে অসম্ভব।'[১৫]

---

[১২] Sayyid Qutb, "Foreword" in Sayyed Abul Hasan Ali Al-Nadwi, Islam and the World: The Rise and Decline of Muslims and its Effect on Mankind (Leicester: UK Islamic Academy), p. vii.

[১৩] Ibid., p. vii

[১৪] Ibid.

[১৫] Ibid.

তবে এই পরিস্থিতি বোধহয় এখন আর নেই। মুসলমানরা এখন আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত। তারা এমন এক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার সাথে যুক্ত, যা তাদের হাতে গড়া নয়। ইদানিং তারা ধর্ম ও রাজনীতির পৃথকীকরণের দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করে নিচ্ছে। সব মিলিয়ে 'অনুগামী' না হয়ে আর উপায় থাকছে না।

'পাশ্চাত্যের' সাথে মতাদর্শিক দূরত্ব, ঔপনিবেশিক দখলদারিত্ব, মুসলিম আত্মপরিচয়সহ যেসব ইস্যু সাইয়েদ কুতুবের চিন্তাজগতকে আজ থেকে অর্ধশতক আগে প্রভাবিত করেছিল,[১৬] বর্তমানকালের ইসলামপন্থী তাত্ত্বিকদের বিবেচনায় সেগুলো আর তত বড় বিষয় বলে মনে হচ্ছে না। সাইয়েদ কুতুব পুঁজিবাদ ও কমিউনিজম দুটোকেই ইসলামের তুলনায় নিম্নমানের মনে করতেন।[১৭] তার মতে, এ দুটোই বস্তুবাদ থেকে উদ্ভূত। তাই এ দুটির কোনোটি (যেমন– কমিউনিজম) ন্যায়বিচারকে প্রাধান্য দিয়ে থাকলেও যাবতীয় আধ্যাত্মিক ব্যাপারকে পুরোপুরি বাতিল করে দেয়।

এমতাবস্থায় সহজাত পরিবর্তনের অংশ হিসেবে ইসলামপন্থা এখন বিরোধিতা ও সমঝোতা, গ্রহণ ও বর্জনের মাঝে এক ধরনের ভারসাম্য বজায় রেখে চলছে। ইসলামপন্থা স্থান ও কালের দাবি পূরণ করছে। যেমন–

১. আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি ও ঔপনিবেশিকতাবাদ মোকাবেলার জন্য গঠনমূলক নৈতিকতা অর্জনের একটি উপায় হিসেবে ইসলামকে কাজে লাগানো হয়েছিল।

২. একসময় সেকুলার রাজনীতিতে অংশগ্রহণকে একপ্রকার 'ধর্মদ্রোহিতা' হিসেবে মনে করা হতো। তাই ইসলামপন্থা ছিল সেকুলারাইজেশন মোকাবেলার একটি মাধ্যম।

৩. জাতীয়তাবাদী-সেকুলার অভিজাত শ্রেণী ও রাষ্ট্রের সাথে মতবিরোধ প্রসঙ্গে ইসলামের পুনর্জাগরণবাদী (সাহওয়াহ ইসলামিয়্যাহ) আন্দোলনগুলো আত্মপরিচয়ের প্রশ্নকে প্রধান ইস্যু আকারে উপস্থাপন করে।

---

[১৬] Sayed Khatab, The Political Thought of Sayyid Qutb: The Theory of Jahiliyyah (London: Routledge, 2006).

[১৭] Sayyid Qutb, Al-Adalah Al-Ijtima'iyyah fi Al-Islam [Social Justice in Islam] (Cairo: Makatab Masr, 1949). See also, Sayyid Qutb, Ma'rakat Al-Islam wa Al-Ra'smaliyyah [The Battle of Islam and Capitalism] (Cairo: Dar Al-Shuruq, 1975).

৪. রাষ্ট্র, সমাজ, নৈতিকতা ও জ্ঞানের ইসলামীকরণ – পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এই বিষয়গুলোর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইসলামপন্থার একটি নতুন রূপ দাঁড়িয়েছে, কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে (মিশরে ব্রাদারহুড ও মরক্কোতে পিজেডি এটি করেছে) এবং শুরাকে গণতন্ত্রের সাথে তুলনা করে সেকুলার রাষ্ট্রে এনগেজ হওয়াকে সমর্থন করা হচ্ছে।

৫. ইসলামপন্থা ও বিপ্লব হাতে হাত ধরে এগিয়ে চলছে, এবং ইসলামপন্থী প্রতিরোধ আন্দোলনের উত্থান ঘটেছে।

৬. ওহাবী সালাফীদের বিস্তৃতির ফলে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র ইসলামের আক্ষরিক ব্যাখ্যা ছড়িয়ে পড়ছে।

৭. সালাফীদের মধ্যে বিভাজন এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ও চরমপন্থী সালাফিজমের উত্থান ঘটছে।

৮. মিশর, জর্ডান, সুদান প্রভৃতি দেশের মধ্যপন্থী ইসলামপন্থার মাঝে বিভাজন ঘটছে। ফলে ইতোপূর্বে বাতিল করে দেয়া অবস্থানকে (যেমন– ধর্ম ও রাজনীতির পৃথকীকরণ) গ্রহণ করে নিয়ে ইসলামপন্থার 'যৌক্তিকীকরণ' করা হচ্ছে।

রাজনৈতিক ইসলাম ও মতাদর্শের কী পরিসমাপ্তি ঘটছে?

'পরিবর্তনের ডামাডোলে রাজনৈতিক ইসলামের সমাপ্তি ঘটেছে' কথাটি এখনো দৃঢ়তার সাথে বলা যাচ্ছে না। কারণ, সবার আগে কে কীভাবে রাজনৈতিক ইসলামকে সংজ্ঞায়িত করছে, তার উপর এটি নির্ভর করছে। বর্তমান অবস্থায় একজন গোড়া আদর্শবাদী ব্যক্তি নিশ্চিতভাবেই মনে করবে, রাজনৈতিক ইসলামের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। কিন্তু আদর্শ ও এর চর্চার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থী কেউ এমনটি মনে করবে না। সকল ঘরানা থেকেই ইসলামপন্থীরা ওঠে আসছে। তারা কেউই অপরিবর্তনীয় অবস্থানে নেই। তারা এককেন্দ্রিকও নয়।

আমি নিজে একজন তিউনিশীয় হিসেবে এক নয়া গণতান্ত্রিক রাজনীতির একনিষ্ঠ সমর্থক। যদিও আমি বুরগিবা প্রবর্তিত সেকুলারিজমের অব্যাহত উপস্থিতিকে অস্বীকার করি না। কারণ, এর প্রভাব এখনো বিদ্যমান। সেটাই এখন তিউনিশিয়াকে নতুন করে গড়ে তুলছে, এমনকি তিউনিশিয়ার ইসলামপন্থীদেরকেও।

অনেক তিউনিশীয়, এমনকি আন নাহদার সদস্য ও সমর্থকদের অনেকের মনেই একটি প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে: তবে কি বুরগিবাই সঠিক ছিলেন? আন নাহদাকে এই প্রশ্নটি বিবেচনায় নিতে হবে। এটা ঠিক যে, অসংখ্য নির্যাতন, শাহাদাত, নির্বাসন

ও নানা ধরনের বিয়োগান্তক দুঃখ-কষ্ট সওয়ার পর এই ইস্যুতে সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। এতো ত্যাগ কী তাহলে বৃথা গেল? ইসলাম ও রাজনীতির সহাবস্থানকে একটি স্বাভাবিক ব্যাপার হিসেবে বিবেচনা করার যে প্রকৃত ভিশন, যা তাদের দৃঢ় আস্থা কিংবা অনিবার্যতার উৎস, তা কী আন নাহদা পরিত্যাগ করছে? যে কোনো সময়ের জন্যই এই প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ।

অনুবাদ: আইয়ুব আলী

তিউনিশিয়ায় ইসলামপন্থীদের মতাদর্শিক সমঝোতা

শাদি হামিদ

[বিশ্বব্যাপী ইসলামপন্থা একটি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ব্রুকিংস ইন্সটিটিউশনের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো শাদি হামিদ তার **Islamic Exceptionalism: How the Struggle Over Islam Is Reshaping the World** শীর্ষক বইয়ে এই পরিবর্তনের একটি চিত্র এঁকেছেন। বইটিতে **Tunisia: Islamists Conceding Their Islamism** শিরোনামে একটি চ্যাপ্টার রয়েছে। তিউনিশিয়ার রাজনীতি, বিশেষত সেখানকার ইসলামপন্থীদের কর্মকৌশল বোঝাপড়ার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। - সম্পাদক]

রাষ্ট্র নিয়ে ইসলামপন্থীদের মধ্যে এক ধরনের অবশেসন রয়েছে। এ কারণে মিশরে তারা বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। এর ফলে তাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। নিজেদের কর্মী তো বটেই, আরব অঞ্চলের ব্রাদারহুড ঘরানার অন্যান্য সংগঠনের আপত্তি সত্ত্বেও মুসলিম ব্রাদারহুড প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী ঘোষণার সিদ্ধান্ত নেয়। যার ফলে মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে জটিল রাষ্ট্রগুলোর একটি পরিচালনার দায়িত্ব গত শতাব্দীর সবচেয়ে প্রভাবশালী ইসলামপন্থী সংগঠনটির কাঁধে এসে পড়ে।

যে আন্দোলনটি এক ধরনের নীতি-নৈতিকতা মেনে চলার চেষ্টা করতো, এই সিদ্ধান্তটি সে আন্দোলনকে এক অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দেয়। তাদের নীতিগত অবস্থান হলো, ইসলামের স্বার্থকে দল ও রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বে বিবেচনা করতে হবে। ইসলামপন্থীরা প্রায়ই বলে থাকেন, তারা নিজেদের স্বার্থে ক্ষমতায় যাওয়ার পরোয়া করেন না। বরং তারা যে আদর্শের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন, সেটাই তাদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ। অন্য কেউ যদি এই চিন্তাধারা বাস্তবায়নে অগ্রসর হয় তাহলে তারা সর্বোতভাবে তাদেরকে সমর্থন করবে। (অথচ এখন, ক্ষমতা ও পদের প্রতি আগ্রহ খুব সহজেই ব্রাদারহুড আন্দোলনে একটি কলঙ্কতিলক এঁকে দিলো। তারা বলতো, পদ চাওয়া একটা নিন্দনীয় কাজ। সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলরাই কাউকে মনোনীত করবে।)

সমাজে যা ঘটে তার প্রতিফলনই কোনো না কোনোভাবে রাষ্ট্রে ঘটে। রাষ্ট্র সমাজের উপর নির্ভরশীল। কারা ক্ষমতায় যাবে এবং কীভাবে ক্ষমতা পরিচালনা করবে– এটি নির্ভর করে সমাজের দীর্ঘ ও ক্রমাগত পরিবর্তনের চূড়ান্ত ফলাফলের উপর। তাই, তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রেসিডেন্ট পদ গ্রহণ করা খুব আর্জেন্ট ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল না বলেই মনে হয়। ক্ষমতার জন্য এই বেপরোয়া ভাব দেখানো এক দৃষ্টিতে ব্রাদারহুডের প্রকৃত প্রস্তাবনার (পরিবর্তন শুরু করতে হবে ব্যক্তি থেকে) বিপরীত ধারণাকেই গ্রহণ করার নামান্তর। মনে হচ্ছে, ব্রাদারহুড যেন গোড়া থেকে পরিবর্তনের (bottom-up transformation) যে সম্ভাবনা, তার উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে।

তুরস্কে এরদোয়ান ও একেপি যেভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করছে, তা উঠতি ইসলামী প্রজন্মের কাছে কাজের ধরন হিসেবে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।[১] অবশ্য 'আকর্ষণীয় হয়ে ওঠার' মধ্যে কিছুটা সমস্যা রয়েছে। কারণ, এতে মসজিদ, পরিবার ও কমিউনিটির জন্য নির্ধারিত দায়িত্বগুলো রাষ্ট্র কর্তৃক গ্রহণ করে নেয়ার একটা আশংকা থাকে। একটি বিশেষ দলের সাথে এ ধরনের নিছক ধর্মীয় তৎপরতার সংশ্লিষ্টতা ঝুঁকিপূর্ণ। রাজনীতিতে ইসলামের ভূমিকা কিংবা নিছক ধর্মীয় ব্যাপারগুলোর ভূমিকা আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার জন্য কাজ করা যদি একটি নির্দিষ্ট দলের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে, তাহলে ধার্মিকদের ধর্মভীরুতার উপর দলটির রাজনৈতিক ব্যর্থতা এবং ভুল পলিসির নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়কারী মুসলমানদের ৭৪ শতাংশ ২০১৪ সালে এরদোয়ানকে সমর্থন দিয়েছিল। ২০১০ সালে তা ছিল ৬৭ শতাংশ।[২] ২০১৫ সালের জুনের নির্বাচনে একেপির রক্ষণশীল ভিত আরো বৃদ্ধি পেলেও তা সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের মতো যথেষ্ট বাড়েনি। সামগ্রিকভাবে বরং দলটির জনপ্রিয়তা কিছুটা কমেছে। যতদিন পর্যন্ত

---

[১] Alexander Christie-Miller, "Erdogan Launches Sunni Islamist Revival in Turkish Schools," Newsweek, December 16, 2014, http://www.newsweek.com/2014/12/26/erdogan-launches-sunni-islamist-revival-turkish-schools-292237.html.

[২] "Turks Divided on Erdogan and the Country's Direction," Pew Research Center, July 30, 2014, http://www.pewglobal.org/2014/07/30/turks-divided-on-erdogan-and-the-countrys-direction/; "Turks Downbeat about Their Institutions," Pew Research Center, September 7, 2010, http://www.pewresearch.org/2010/09/07/turks-downbeat-about-theirinstitutions/.

ইসলামপন্থীরা সাফল্যের দেখা পেয়েছে, ততদিন পর্যন্ত চিন্তার কিছু ছিল না। কারণ, একেপির শাসনামলে মাথাপিছু জিডিপি বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে এবং ১০ বছরের মধ্যে গড় জিডিপি বেড়ে প্রায় তিনগুণ হয়েছে। সুশাসন ও জীবনমানের উন্নতির সাথে তুর্কি ইসলামপন্থীদের নাম যুক্ত হয়ে পড়েছে।[৩] কিন্তু তাদের নাম যদি রাজনৈতিক বিভেদ, সাংবাদিকদের কণ্ঠরোধ এবং একটি নিম্নমুখী অর্থনীতির সাথে জড়িয়ে যায়, তাহলে এর পরিণতি কী?

এরদোয়ানের স্বৈরাচারী আচরণের কারণে 'ইসলামপন্থার প্রথম বড় ধরনের সম্ভাবনা' একেপির পতন ঘটলে তিউনিশিয়ার ইসলামপন্থীরা 'ইসলামপন্থার পরবর্তী বড় ধরনের সম্ভাবনা' হিসেবে বিবেচিত হবে। স্বৈরাচারী শাসন ও গৃহযুদ্ধের উপর বিতৃষ্ণ আরব অঞ্চলের মানুষের নিকট তিউনিশিয়া একটি আকর্ষণীয় উদাহরণ হয়ে ওঠেছে। যার ফলে তিউনিশিয়ার প্রধান ইসলামী দল আন নাহদার (যার অর্থ হচ্ছে 'রেনেসাঁ') সীমাবদ্ধতা ও ব্যর্থতার কারণে গণমানুষের প্রত্যাশা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

দ্যা গ্রেট ইসলামিস্ট হোপ

আন নাহদার সম্ভাবনা সহজেই অনুমেয়। আরব অঞ্চলের অন্যান্য ইসলামপন্থী দলে তরুণ সদস্যদের যেখানে প্রতিনিয়ত টিকে থাকার সংগ্রাম করতে হয়, আন নাহদা সেখানে নতুন প্রজন্মের নেতাকর্মীদের গড়ে তুলছে। যাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও বক্তব্য বয়স্কদের চেয়ে ভিন্ন।

ইংরেজি ও ফরাসী ভাষায় পারদর্শী, মাত্র আটাশ বছরের তরুণী সাইয়েদা ওয়ানিসি তিউনিশিয়ার তরুণ সংসদ সদস্যদের অন্যতম। তার বাবা আন নাহদার সদস্য ছিলেন। সরকারের নির্যাতনের মুখে তিনি পরিবারসহ প্যারিসের উদ্দেশ্যে তিউনিশিয়া ত্যাগ করেন। তখন ওয়ানিসির বয়স ছিল মাত্র নয় বছর।[৪] প্যারিসের প্রবাস জীবনে তিনি বেড়ে ওঠেন। একজন ফিলিস্তিনী-আমেরিকান বিশেষজ্ঞের বাসায় ২০১৫ সালের শুরুর দিকের এক সকালে জম্পেশ নাস্তা শেষে কফি পান করতে করতে তার সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তার পরনে ছিল ফ্যাশনেবল হেডস্কার্ফ। রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মের ব্যবহার অর্থাৎ কোরআন-হাদীসের বক্তব্য অতিরঞ্জিত করে নেতৃবৃন্দ যেসব রাজনৈতিক বক্তব্য দিতো আন নাহদা কিছুদিন আগে তা 'পরিত্যাগ' করেছে, যদিও সেকুলার

---

[৩] "World Data Bank: World Development Indicators," World Bank, http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx

[৪] প্রকৃতপক্ষে ওয়ানিসির বয়স তখন ছিল ছয় বছর। লেখক সম্ভবত ভুলবশত নয় বছর উল্লেখ করেছেন। – অনুবাদক

দলগুলো রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মের ব্যবহার অব্যাহত রেখেছে। ওয়ানিসি এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন। তবে নিজ পরিচয় সম্পর্কে তিনি সচেতন। বাগাড়ম্বরপূর্ণ কথাবার্তা বলে তিনি আলোচনাকে ভারাক্রান্ত করার প্রয়োজন মনে করেননি। কিন্তু তার নিজের ব্যাপারে বড় সমস্যা হলো– সরাসরি নির্যাতনের শিকার হওয়ার অভিজ্ঞতা যার রয়েছে, তেমন ব্যক্তির মনে সেই কালো দিনগুলো ফিরে আসার যে আশংকা সবসময় কাজ করে, তেমন অভিজ্ঞতা তার নেই।

ধর্মকে 'ব্যবহার' করলে সাময়িকভাবে হয়তো লাভবান হওয়া যায়, কিন্তু এটা খুব সহজে বুমেরাংও হতে পারে। তিনি বলছিলেন, "আমরা, অর্থাৎ আন নাহদার তৎপরতা যদি কাউকে কখনো হতাশও করে, তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে নামাজ ছেড়ে দেয়াটা কারো জন্য প্রাসঙ্গিক বিবেচিত হবে না। যদি কোনো দিন আমরা জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলি, এমনকি ১০ শতাংশের বেশি ভোট নাও পাই; আমরা চাই, তেমন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও মসজিদগুলো যেন আক্রান্ত না হয়, হিজাব পরিহিত নারীরা রাস্তায় বেরিয়ে যেন বিপদে না পড়ে।"[৫]

অন্যান্য ইসলামপন্থী দলগুলোর মতো আন নাহদাও দীর্ঘমেয়াদী কৌশলকেই একমাত্র কৌশল মনে করতো। কিন্তু ২০১১ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০১৩ সালের শেষ পর্যন্ত দুটি সেকুলার দলের সাথে কোয়ালিশন করে স্বল্প সময়ের জন্য ক্ষমতায় থাকার অভিজ্ঞতা ছিল আন নাহদার জন্য খুবই চ্যালেঞ্জিং ও সংকটপূর্ণ, যা তাদের অতীত রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার সাথে খাপ খায় না। বেন আলী ক্ষমতায় এসে সংগঠনটিকে ক্রমান্বয়ে নিঃশেষ করে দিয়েছিলেন। ফলে নব্বই পরবর্তী এক দশকে আন নাহদার কার্যকর কোনো অস্তিত্ব ছিলই না বলা যায়। দলের নেতৃবৃন্দকে জেলে পুরে রাখা হয়েছিল। অনেকে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও ইটালিতে নির্বাসিত জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছিল। আরব বসন্তের প্রথম ধাক্কাতেই বেন আলীর পতন ঘটে। তারপর দেশটির প্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচনে আন নাহদা জয়লাভ করে। দল থেকে একজন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দলটির এই ক্ষমতা লাভকে আকস্মিক ঘটনাই বলা চলে। তবে পেছনে ফিরে তাকালে বুঝা যায়, তারা কিছু কৃতিত্বের দাবি করতেই পারে। তারা দেখিয়ে দিয়েছে সেকুলারদের সাথে ইসলামপন্থীদের ক্ষমতা ভাগাভাগি করা সম্ভব। তিউনিশিয়ার বেশিরভাগ প্রতিবেশী দেশের ক্ষেত্রে যা কল্পনাও যায় না। তবে সম্ভবত তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য হচ্ছে, ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে বৃহত্তর ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে তুলনামূলকভাবে উদার একটি সংবিধান পাশ করানো।

[৫] লেখকের সাথে আলাপচারিতা, সাইয়েদা ওয়ানিসি, ফেব্রুয়ারি ৬, ২০১৫।

তারপরেও দলটি যে কোনো সময় ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। ২০১৩ সালে তা প্রায় হয়েও গিয়েছিল। দুজন বিশিষ্ট বামপন্থী নেতা আততায়ীর হাতে নিহত হওয়ার পর তিউনিশিয়ায় নজিরবিহীন রাজনৈতিক মেরুকরণ তৈরি হয়। পপুলার ফ্রন্টের মতো বামপন্থী দলগুলো অভিযোগ করে, এই হত্যাকাণ্ডের জন্য আন নাহদা পরোক্ষভাবে দায়ী। তাদের যুক্তি হলো, আন নাহদাই চরমপন্থীদেরকে তৎপরতা চালানোর সুযোগ করে দিয়েছে।[৬] এই পরিস্থিতিতে তিউনিশিয়ার ইসলামপন্থীদের মধ্যে আবারো নির্যাতনের যুগ ফিরে আসার ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। একই সময়ে মিশরে সেনা অভ্যুত্থানের ফলে এই ভীতি আরো বেড়ে যায়। বহু কষ্টে অর্জিত গণতান্ত্রিক উত্তরণ প্রক্রিয়াকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আন নাহদার নেতৃবৃন্দ যে কোনো ধরনের সাংঘর্ষিক পরিস্থিতিকে এড়িয়ে চলতে থাকেন। অধিকাংশ বিরোধী সেকুলার দল দাবি করতে থাকে– হয় গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সংবিধান সভা ভেঙ্গে দিতে হবে, নয়তো গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার ভেঙ্গে দিতে হবে। না হলে উভয়টিই ভেঙ্গে দিতে হবে। ঠিক যেন মিশরের ঘটনার প্রতিধ্বনি! বিরোধী পক্ষগুলো পরোক্ষভাবে আন নাহদাকেই সরিয়ে দিতে চাচ্ছিল। মুরসির পতনের লক্ষ্যে মিশরে সংঘটিত তামাররুদ (বিদ্রোহ) আন্দোলনের পর তিউনিশিয়ায়ও একইভাবে তামাররুদ আন্দোলন শুরু হয়। মিশরের 'ন্যাশনাল স্যালভেশন ফ্রন্ট' থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তিউনিশিয়ার 'স্যালভেশন ফ্রন্ট' আন নাহদা সরকারের নিয়োগকৃত স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অপসারণের লক্ষ্যে আন্দোলনের ডাক দেয়।[৭]

ইসলামপন্থীরা নির্বাচনে জিতে এলেও তাদেরকে কখনোই সরকার চালাতে দেয়া হবে না– আন নাহদার এই আশংকা যে সঠিক, মিশরের পরিণতি থেকে তা নিশ্চিত হওয়া যায়।[৮] ২০১৫ সালের শুরুর দিকে আন নাহদার নেতা ও সহ-প্রতিষ্ঠাতা রশিদ

---

[৬] Monica Marks, "Tunisia Opts for an Inclusive New Government," Washington Post, February 3, 2015, http://www.washingtonpost.com/blogs/monkey-cage/wp/2015/02/03/tunisia-opts-for-an-inclusive-new-government/.

[৭] Nissaf Slama, "'Irhal' Campaign Attempts to Oust Ennahda Officials," Tunisia Live, August 14, 2013, http://www.tunisialive.net/2013/08/14/erhal-campaignattempts-to-oust-enahdha-officials/.

[৮] মিশরীয় সামরিক ক্যুর পর আন নাহদার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আরো জানতে দেখুন Monica Marks, "Tunisia's Ennahda: Rethinking Islamism in the Context of ISIS and the Egyptian Coup," working paper, Brookings Institution, Rethinking

ঘানুশীর সাথে যখন কথা বলছিলাম, ততদিনে মিশরের ঘটনা ম্রিয়মান হয়ে গেছে। কিন্তু তার কাছে মিশরের ক্যু যেন তখনো খুব তাজা ছিল। তিনি বলছিলেন, মিশরের ফলাফল দেখে "এখানেও বিরোধীরা উচ্চাকাঙ্খী হয়ে উঠলো এবং ক্ষমতাসীনদেরকে রাস্তায় ছুড়ে ফেলতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে লাগলো...। এমনকি মিশরের মতো একই নামে তারা নিজেদেরকে অভিহিত করলো!"[৯]

আমার ধারণা ছিল, আমার মতো পশ্চিমা দেশে বসবাসকারী গবেষকের সাথে কথা বলার সময় আন নাহদার কর্তাব্যক্তিরা গণতন্ত্রের প্রতি নিজেদের মহানুভবতা দেখাতে সচেষ্ট থাকবেন। কিন্তু আন নাহদার বেশিরভাগ নেতা তাদের সহযোগী আরব ইসলামপন্থীদের পতনের ব্যাপারে স্পষ্টতই আবেগতাড়িত ও ব্যক্তিগত মন্তব্য করেছেন। সংবিধান সভার ভাইস প্রেসিডেন্ট মেহেরজিয়া লাবিদী বলেন, "রাবেয়া স্কয়ারের ঘটনায় আমি ক্ষুব্ধ হয়েছি। ISIS-এর লোকেরা যে অমানবিক তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু মিশরে স্বয়ং রাষ্ট্রই বর্বর হয়ে উঠেছে। মিশরীয় সংঘাতের এই নিষ্ঠুরতা তিউনিশিয়াতেও বিশাল ধ্বংসাত্মক শক্তি হয়ে ওঠার আশংকা ছিল। কিন্তু তিউনিশিয়ার কেউই এটি চায়নি। তাই রাজনীতিবিদরা সংলাপের জন্য আলোচনার টেবিলে বসেছেন।[১০] এবার আন নাহদার সংসদ সদস্য ত্রিশ বছর বয়সী তরুণী ইমান বেন মোহাম্মদের কথা বলা যাক। তিনি বলেছেন, "মিশরের ঘটনার জন্য আমরা মর্মাহত। তবে আমাদের সমর্থকদেরকে কনভিন্স করার জন্য এই ঘটনা ইতিবাচক হয়েছে বলা যায়। তারা দেখেছে, অতি উৎসাহী কর্মকাণ্ড থেকে ব্রাদারহুড সাময়িকভাবে লাভবান হলেও দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অথচ গণতন্ত্র থাকার উপরেই নির্ভর করছে আপনার রাজনৈতিক অস্তিত্ব।[১১]

সমঝোতার মাধ্যমে স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ায় হয়তো আন নাহদার পতন ঘটতে পারতো। তিউনিশিয়ার প্রেক্ষাপট তেমনই বলে। তারপরও এত বড় ঝুঁকি নেয়ায় এর কৃতিত্ব দলটির প্রাপ্য। সবচেয়ে বড় কথা হলো, যে কোনো ধরনের খারাপ পরিস্থিতিকে তারা এড়াতে পেরেছে। 'স্বাভাবিক' গণতান্ত্রিক পরিবেশেও এতটা আশা করা যায় না। অথচ আন নাহদা কিন্তু একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়েছিল।

Political Islam series, August 2015,
http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Reports/2015/07/rethinking-political-islam/Final-WorkingPapers/Tunisia_Marks_FINALv.pdf?la=en.

[৯] লেখকের সাথে আলাপচারিতা, রশিদ ঘানুশী, ফেব্রুয়ারি ১৩, ২০১৫।

[১০] লেখকের সাথে আলাপচারিতা, মেহেরজিয়া লাবিদী, ফেব্রুয়ারি ৬, ২০১৫।

[১১] লেখকের সাথে আলাপচারিতা, ইমান বেন মোহাম্মদ, ফেব্রুয়ারি ৯, ২০১৫।

সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতি হিসেবে বিরোধী পক্ষ সরকারকে ক্ষমতা থেকে নামাতে চাইলে অনাস্থা ভোট আয়োজনের চেষ্টা করতে পারতো। সেক্ষেত্রে আন নাহদার দায়িত্ব ছিল জনগণের এ ধরনের কোনো ইচ্ছা থাকলে, তা ব্যক্ত করার সুযোগ দেয়ার জন্য আগাম নির্বাচনের আয়োজন করা। কিন্তু সেখানে এসব কিছুই ঘটেনি। একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখার সুযোগ পেয়েও সেকুলাররা তা কাজে লাগাতে মোটেও রাজি ছিল না। ফলে আন নাহদা ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, অন্যসব অগ্রগতি সত্ত্বেও অতীতে তো বটেই, এমনকি বর্তমানেও তিউনিশিয়া একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। গণতান্ত্রিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এখন পর্যন্ত 'স্বাভাবিক' হয়ে ওঠেনি। তাই আন নাহদার মতো ধর্মভিত্তিক দলকে বিকল্প কৌশল অবলম্বন করে চলতে হচ্ছে। এই জটিল পরিস্থিতিকে সাইয়েদা ওয়ানিসি তুলনা করেছেন পরস্পরের প্রতি প্রচণ্ড গতিতে ধাবমান দুটি হাই-স্পিড ট্রেনের সাথে। বলাবাহুল্য, ট্রেন দুটি হচ্ছে অনমনীয় সেকুলার ও ইসলামপন্থী পক্ষ। ফলে এক পক্ষকে নিরাপদ পথ বেছে নিতে হয়েছিল। ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত তাদের ছাড় দেওয়া অব্যাহত রয়েছে। এরই অংশ হিসেবে দেশটির সর্ববৃহৎ ও সবচেয়ে সুসংগঠিত দল আন নাহদা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী না দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এমনকি অন্য কোনো প্রার্থীকেও তারা সমর্থন দেয়নি। তারপর ২০১৪ সালে সংসদ নির্বাচনের সময় একটি অদ্ভূত দৃশ্য দেখা গেলো– পরাজিত দল নিজেদের পরাজয়কে উদযাপন করছে! অবশ্য ইসলামপন্থী দলগুলোর 'ইচ্ছাকৃত পরাজয়ের' ব্যাপারটি আরব বসন্তের আগে থেকেই খুব অস্বাভাবিক কিছু ছিল না।[১২] আন নাহদার একজন জ্যেষ্ঠ নেতার উচ্ছ্বাস ছিল এ রকম– আমরা ভারমুক্ত হয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ।[১৩]

তবে এই ঘটনার পর ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে সেকুলার নিদা তিউনেসের সাথে কোয়ালিশন সরকারে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্তটি 'দৃষ্টিকটু' ছিল। ওয়ানিসি অবশ্য ব্যাপারটা স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন, আমার মতো আমেরিকানের জন্য নাকি ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারা কিছুটা কঠিন। ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকানরা কখনোই একসাথে একই সরকারে থাকতে চাইবে না– তার এই ব্যাখ্যা সম্ভবত ঠিকই আছে। কিন্তু এর ফলে আবারো প্রশ্ন ওঠে, আন নাহদা কেন এমন কিছু করতে

[১২] দেখুন, Shadi Hamid, "Arab Islamist Parties: Losing on Purpose?" Journal of Democracy 22 (2011), pp. 68–80.

[১৩] লেখকের সাথে আলাপচারিতা, আন নাহদার একজন জেষ্ঠ্য কর্মকর্তা, ফেব্রুয়ারি ৭, ২০১৫।

গেলো, কোনো 'স্বাভাবিক' গণতান্ত্রিক দল যা করবে না? ২০১৪ সালের অক্টোবরের নির্বাচনে সংসদীয় আসনের ৩১ শতাংশ সিট পেয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা সত্ত্বেও একুশটি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে মাত্র একটি (তাও সেটি হলো তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়) এবং তিনটি স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী পদের বিনিময়ে আন নাহদা সমঝোতা করেছে। আপনি যদি সরকারে অংশগ্রহণ করতেই চান, তাহলে কেন মাত্র একটি ক্যাবিনেট পদ নিলেন? একা একজন মন্ত্রীর হয়তো প্রতীকী তাৎপর্য আছে, কিন্তু এটি পরিস্কারভাবে প্রমাণ করে দিয়েছে: আন নাহদা তথা ইসলামপন্থীদেরকে অভ্যন্তরীণভাবে কোনঠাসা করা যতটা কঠিন, বাইরে ততটা নয়।

এ ব্যাপারে তৃণমূল পর্যায়ে অসন্তুষ্টি থাকলেও আন নাহদার নেতারা বিশ্বাস করেন– এটাই হলো একমাত্র অনুসরণীয় পন্থা। তাদের এই বিশ্বাস ঈমানের প্রায় কাছাকাছি। এমনই একজন নেতা হলেন সাঈদ ফারজানী। ভূতপূর্ব প্রখ্যাত সাংবাদিক অ্যান্থনি শাদীদ ২০১২ সালে নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত এক নিবন্ধে তার ব্যাপারে আলোকপাত করেছিলেন। প্রথম দিকে ফারজানী ছিলেন কিছুটা কট্টরপন্থী। তিউনিশিয়ার 'জাতির জনক' হাবিব বুরগিবার বিরুদ্ধে তিনি তখন একটা অভ্যুত্থান প্রায় করে ফেলেছিলেন। কিন্তু বুরগিবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বেন আলী অকল্পনীয়ভাবে ফারজানী ও তার সহযোগীদের ডিঙ্গিয়ে, তাদের সতের ঘণ্টা আগেই অভ্যুত্থান করে ক্ষমতায় চলে আসেন। পরে ফারজানী গ্রেফতার হন। তাকে অকথ্য নির্যাতন করা হয়। নির্যাতনে তার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায়।[১৪]

অ্যান্থনি শাদীদের সাথে সাক্ষাৎকারে ফারজানী ১৯৭০-এর দশকে রশিদ ঘানুশীর সাথে তার পড়ালেখার কথা স্মরণ করছিলেন। ফারজানী বলছিলেন, "আমরা মুসলমানরা কেন পিছিয়ে আছি? এর অন্তর্নিহিত কারণ কী? এটাই কি আমাদের নিয়তি? ঘানুশী সবসময় এ জাতীয় বিশ্ব পরিস্থিতি ও রাজনীতি নিয়ে কথা বলতেন।"[১৫] আধুনিক ইসলামপন্থীদের মধ্যে বহু আগে থেকেই এই প্রশ্নগুলো ছিল। আন নাহদার নেতৃবৃন্দের ধারণা ছিল, তারা নিজেরা এই প্রশ্নগুলোর এক ধরনের সমাধান দিতে পারবেন। যদিও ইতোমধ্যে তাদের কর্মপদ্ধতিতে যথেষ্ট পরিবর্তন এসেছে। কোয়ালিটি অর্জন করাটা দীর্ঘমেয়াদী ব্যাপার। যা হোক, ২০১৪ সালের

---

[১৪] Anthony Shadid, "Islamists' Ideas on Democracy and Faith Face Test in Tunisia," New York Times, February 17, 2012, http://www.nytimes.com/2012/02/18/world/africa/tunisia-islamists-test-ideas-decades-in-the-making.html.

[১৫] Ibid.

নির্বাচনের হতাশাজনক সমাপ্তির পর আন নাহদার গৃহীত কৌশলের কার্যকারিতা নিয়ে আমি ফারজানীকে প্রশ্ন করলে তিনি এক ধরনের সমঝোতার কথা স্বীকার করে নিয়ে বললেন, "সরকারে অংশগ্রহণ এবং একটি মন্ত্রী পদ গ্রহণ করার ফলে কিছুটা জনপ্রিয়তা যে হারাতে যাচ্ছি, তা আমরা জানি।[১৬] তিনি জোর দিয়ে বলছিলেন, "এটা এক ধরনের অন্তবর্তী সময়।" এই অবস্থা থেকে উত্তরণে পনের থেকে বিশ বছর সময় লেগে যেতে পারে। তার মতে, তারপরই কেবল আন নাহদার কাজকর্ম নিয়ে এ ধরনের প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। তিনি বার বার এ জাতীয় কথাগুলোই বলছিলেন। এখন অন্যরকম একটা সময় চলছে। এই সময়ের লক্ষ্য হলো পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করা, ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা এবং মৌলিক অধিকারগুলো নিশ্চিত করা। এতে করে দলীয় ঐক্যকে কম গুরুত্ব প্রদান কিংবা অস্থিরমনা সমর্থকদের বিরক্তি বেড়ে গেলেও এই কাজগুলো করতে হবে।

আন নাহদার এই কৌশল কি দূরদর্শী রাজনীতির অংশ, নাকি উচ্চাকাঙ্খী চিন্তা– তা নির্ভর করছে আপনি ব্যাপারটাকে কীভাবে দেখছেন। কারো পক্ষে যতটুকু স্বচ্ছতার কথা কল্পনা করা সম্ভব, ২০১৪ সালের নির্বাচনী প্রচারণায় আন নাহদা ততটুকু স্বচ্ছতাই দেখিয়েছে। যদিও অধিকাংশ দলই তা করেনি। দলটি ইসলামপন্থার উপর কম গুরুত্ব দিয়েছে এবং নিজেদেরকে জাতীয় ঐক্যের 'মধ্যমনি' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আন নাহদার প্রথম সারির মুখপাত্রগণ বয়সে মূলত তরুণ। তাদের দাড়িবিহীন কর্মকর্তাদেরকে আপনার সহজেই নজরে পড়বে। দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান নিয়ে তারা বিরতিহীনভাবে কথা বলে যেতে পারেন। তারা যে একটি ইসলামপন্থী দলের সদস্য, নিছক কথাবার্তা শুনে তা বুঝার কোনো উপায় নেই। একজন ক্যাম্পেইন অর্গানাইজার আমাকে বলেছেন, তাদের এই আচরণ ও আত্মসচেতনতা আন নাহদার 'নয়া দৃষ্টিভঙ্গির' প্রতিফলন। ধর্মীয় রেটরিকের ব্যবহার ছেড়ে দলটি সতর্ক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারায় তারা গর্বিত।[১৭]

আদর্শিক বিভাজনের প্রশ্নে আন নাহদা যেখানে সুর নরম করছে, নিদা তিউনেস সেখানে ইসলামপন্থী বনাম সেকুলার প্রশ্নে সুর চড়াচ্ছে। যা স্পষ্টতই সংঘাতের উসকানি। পতিত শাসকগোষ্ঠী, বামপন্থী এবং নিও-লিবারেল ব্যবসায়ীরা মিলে নিদা তিউনেস গঠন করেছে। দলটির এই গ্রুপগুলো অন্যসব বিষয়ে খুব একটা একমত হতে না পারলেও ইসলামপন্থী ও ইসলামপন্থার অস্তিত্বই যে একটা হুমকি এবং একে

[১৬] লেখকের সাথে আলাপচারিতা, সাঈদ ফারজানী, ফেব্রুয়ারি ৭, ২০১৫।

[১৭] লেখকের সাথে আলাপচারিতা, আন নাহদার একজন ক্যাম্পেইন অর্গানাইজার, ফেব্রুয়ারি ১২, ২০১৫।

যে পরাজিত করা প্রয়োজন, সে ব্যাপারে পুরোপুরি একমত। তিউনিশীয় সেকুলারদের নিয়ে যে কয়েকজনের গভীর জানাশোনা আছে, তাদের একজন হলেন অ্যানি উলফ। তিনি লিখেছেন, "ইসলামপন্থার বিরোধিতাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা (নিদা তিউনেসের) অন্যতম দুর্বলতা।"[১৮] তাত্ত্বিকভাবে হয়তো এটি সত্য। তবে নির্বাচনী রাজনীতির জন্য মেরুকরণ, মতাদর্শ এবং ব্যক্তি আক্রমণ আপাতদৃষ্টিতে সুফল বয়ে আনে বলেই মনে হয়। ২০১১ সালে যে দলটির অস্তিত্বই ছিল না, সেই নিদা তিউনেস ৩৭.৫ শতাংশ ভোট এবং ৮৬টি আসন পেয়ে নির্বাচনে প্রথম স্থান লাভ করেছে। এছাড়া দলটির প্রধান নেতা ৮৮ বছর বয়সী বেজি সাইদ এসেবসি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সহজেই জয় লাভ করেছেন। অন্যদিকে, ঘানুশী আরো বেশি সমঝোতার মনোভাবসম্পন্ন হয়ে ওঠেছেন। সংঘাত এড়িয়ে তিনি মধ্যপন্থী পথে এগিয়ে গেছেন। এভাবে তিনি এক অর্থে ফাউন্ডার ফাদার হিসেবে নিজের ইমেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন, নিজের জনপ্রিয়তার উচ্চমান প্রতিষ্ঠা করেছেন।[১৯]

সমালোচকদের মতে, এসেবসির উত্থান বিপ্লবের প্রতি এক ধরনের আঘাত। এসেবসি ছিলেন বেন আলী প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। হাবিব বুরগিবার আমলেও তিনি স্বরাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ছিলেন। অবশ্য, তিউনিশীয় সেকুলারদের অনেকে এমনটা মনে করেন না। নির্বাচনের আগে পিউ রিসার্চের এক জরিপের ফলাফল এমনটাই ইঙ্গিত করে। দেখা গেছে, একনায়কতন্ত্রের প্রত্যাবর্তনকে সমর্থনের প্রশ্নে ধর্মানুরাগীদের চেয়ে ধর্মীয় আচার কম মানা তিউনিশীয়রাই বেশি এগিয়ে। জরিপে অংশগ্রহণ করা ৪১ শতাংশ মানুষ একনায়কতন্ত্রকে সমর্থন করেছেন। এরা অনিয়মিতভাবে নামাজ পড়েন। অন্যদিকে, ৫২ শতাংশ মানুষের মতামত হলো, 'একজন শক্তিশালী নেতার' কাছে গণতন্ত্রই অধিকতর পছন্দনীয়। এই মতামত প্রদানকারীরা প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত

[১৮] Anne Wolf, "Can Secular Parties Lead the New Tunisia?" Carnegie Endowment for International Peace, April 30, 2014, http://carnegieendowment.org/2014/04/30/can-secular-parties-lead-new-tunisia

[১৯] Pew Research Center, spring 2014 survey, topline results, http://www.pewglobal.org/files/2014/10/Pew-Research-Center-Tunisia-Report-TOPLINE-October-15-2014.pdf, p. 17.

নামাজ পড়েন।[২০] ২০১২ সালের আরেক জরিপে ৭৮ শতাংশ তিউনিশীয় মত দিয়েছিলেন, তাদের জীবনে ধর্ম 'খুব গুরুত্বপূর্ণ'। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ৬৩ শতাংশ জানিয়েছেন, তারা প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন এবং ৯৬ শতাংশ মানুষ জানিয়েছেন, তারা রমজানে রোজা রাখেন।[২১]

"মধ্যপন্থার দিকে আমাদের যাত্রা"

তুরস্কের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, প্রচণ্ডভাবে বিভক্ত তুর্কি সমাজে ইসলামপন্থীদের পক্ষে ও বিপক্ষে শক্ত অবস্থান রয়েছে। মাঝামাঝি কোনো অবস্থান সেখানে টিকতে পারে না। তাই একটা শক্ত অবস্থান তৈরি ও গণভিত্তি পেতে হলে এই বাস্তবতা বিবেচনায় রাখা সেখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তবে তুরস্কের এই প্রেক্ষাপটের আলোকে কেউ যদি আন নাহদার নির্বাচনী কৌশলকে ব্যর্থ মনে করে (যদিও তা ব্যর্থই বটে), তাহলে একটা বিষয় এড়িয়ে যাওয়া হয়। মধ্যপন্থার দিকে এগিয়ে যাওয়া মানেই নির্বাচনে জয়ী হওয়া নয়– আন নাহদার শীর্ষ নেতৃত্ব এই সত্যটা মেনে নিতে প্রস্তুত। তারা মনে করেন– তারা যা করছেন, পরিণতির কথা না ভেবেই সেগুলো করে যেতে হবে। ওয়ানিসি আমাকে যেমনটা বলেছিলেন, "আমরা এই মুহূর্তে নির্বাচনী কৌশল নিয়ে ভাবছি না। বরং তিউনিশিয়ার সামগ্রিক ভালোমন্দ মাথায় রেখেই কাজ করছি। এটাকেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি। এর ফলে আমরা যদি নির্বাচনে দ্বিতীয় অবস্থানেও চলে যাই, তাহলে আমরা তা নিয়েই সন্তুষ্ট।" এ প্রসঙ্গে মেহেরজিয়া লাবিদীর কথাও বলা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন, মধ্যপন্থার দিকে যেতে হলে মূল্য দিতে হয়। নির্বাচনে হেরে যাওয়া হচ্ছে আমাদের সেই প্রদেয় মূল্য।"

আন নাহদার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ও শীর্ষস্থানীয় তাত্ত্বিক নুরুদ্দীন আরবাউয়ীর মতো কেউ কেউ স্বীকার করেছেন, বিভিন্ন পলিসির খুঁটিনাটি বিষয়ের উপর অত্যাধিক গুরুত্বারোপ এবং দক্ষ বিশেষজ্ঞদের নিয়োগের মাধ্যমে আন নাহদার উচ্চাকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটেছে বলা যায়। আরবাউয়ী আমাকে বলেছেন, "আমরা যদি বাস্তববাদী হই (অবশ্য এখন পর্যন্ত আমরা বাস্তববাদী) তাহলে বলতে হয়, দলের প্রকৃত কর্মসূচি

[২০] "Tunisian Confidence in Democracy Wanes," Pew Research Center, October 15, 2014, http://www.pewglobal.org/2014/10/15/tunisian-confidence-in-democracy-wanes/.

[২১] "The World's Muslims: Religion, Politics and Society," Pew Research Center, April 30, 2013.

মূল্যায়ন করে কেউ ভোট দেয় না। এমন একজনও নেই, যে ব্যালট বাক্সের নিকট গিয়ে মনে করেছে, এদের কর্মসূচি যেহেতু উদার, তাই এদেরকেই আমি ভোট দিলাম। বরং আমরা যেহেতু আন নাহদা, সে জন্যই সমর্থকরা আমাদেরকে ভোট দিয়েছে। আর অন্যরা নিদা তিউনেসকে ভোট দিয়েছে, যেহেতু তারা আন নাহদার বিরোধী।"[২২]

ভালো-মন্দ যাই হোক, তিউনিশিয়ার গণতান্ত্রিক উত্তরণের দায়িত্ব আন নাহদা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। আরেকটু এগিয়ে আমরা 'তিউনিশীয় মডেলের' কথা বলতে পারি। সেটা হলো: ইসলামপন্থীরা তাদের ইসলামপন্থার ব্যাপারে এক ধরনের আপস করেছে। কারণ তারা তাদের চারপাশে যেসব বিকল্প পদক্ষেপ দেখেছে, তার সবগুলোতেই গণতন্ত্রের পতন ঘটেছে। আন নাহদা হয়তো অযথা ভয় পেয়েছিল, তাই সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ঝুঁকি নেয়নি। তাছাড়া লিবিয়া, সিরিয়া ও ইয়েমেনের উত্তেজনা দরজার উপর কড়া নাড়ছিল, সে কারণেও হয়তো তারা সুযোগটি গ্রহণ করেনি। এ ব্যাপারে ঘানুশীর ব্যাখ্যা হচ্ছে, "হ্যাঁ, আমরা ছাড় দিয়েছি, এটা সত্য। কিন্তু এটি আমাদের জন্য লোকসানী নয়। আমাদের ন্যায্যতা থাকা সত্ত্বেও ২০১৩ সালে আমরা যদি সরকারে থাকতাম, তাহলে দেশ হয়তো ধ্বংস হয়ে যেত।"[২৩]

এটা নিছক কথার কথা নয়। মধ্যপন্থার দিকে আমাদের এই যাত্রা সংগঠনের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ ফলাফল বয়ে এনেছে – ঘানুশী আমাকে এমনটাই বলেছেন।[২৪] আরব বসন্তের শুরু থেকেই আন নাহদার নেতৃবৃন্দ একটি সংকটের মোকাবেলা করতে না করতেই আরেকটা সংকটের মুখোমুখি হচ্ছেন। প্রত্যেকবারই মতাদর্শিক বা বিপ্লবী দাবি থেকে বিরত থাকার জন্য সমর্থকদেরকে নানাভাবে বুঝাতে হয়েছে। সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের সময় শরীয়াহ, লিঙ্গ সমতা এবং ব্লাসফেমি সংক্রান্ত তিনটি বিতর্কিত ধারা থেকে দলটি সরে আসে।[২৫] আন নাহদার সংসদীয় ব্লক শরীয়াহকে আইনের

[২২] লেখকের সাথে আলাপচারিতা, নুরুদ্দীন আরবাউয়ী, ফেব্রুয়ারি ১১, ২০১৫।

[২৩] লেখকের সাথে আলাপচারিতা, রশিদ ঘানুশী, ফেব্রুয়ারি ১৩, ২০১৫।

[২৪] Ibid.

[২৫] Monica Marks, "Convince, Coerce, or Compromise? Ennahda's Approach to Tunisia's Constitution," Brookings Doha Center Analysis Paper, February 10, 2014, http://www.brookings.edu/research/papers/2014/02/10-ennahda-tunisia-constitution-marks.

'উৎসসমূহের উৎস' হিসেবে প্রস্তাব করেছিল।[২৬] আরব দেশগুলোর রীতি অনুসারে যা ছিল খুব স্বাভাবিক ব্যাপার।

যে কোনো ইসলামপন্থী মাত্রই মনে করে থাকেন, শরীয়াহকে যে যেভাবেই ব্যাখ্যা করুক না কেন, জনজীবনে এর একটা ভূমিকা থাকবে। তা সত্ত্বেও একটি ইসলামপন্থী দল শরীয়াহর উল্লেখ পর্যন্ত না করে একটি সংবিধান অনুমোদন করেছে। যদিও সংবিধান সভায় আন নাহদার প্রাধান্য ছিল। তারচেয়েও বড় কথা হলো, তিউনিশীয় সমাজে ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এসব কিছুর পরও আন নাহদা এই ছাড় দিয়েছে। ২০১৪ সালে পিউ রিসার্চ পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, ৫৩ শতাংশ তিউনিশীয় মনে করেন, আইন প্রণয়নে ইসলামী মূল্যবোধ ও নীতিমালা মেনে চলা উচিত। এরমধ্যে আবার ৩০ শতাংশ আরেক ধাপ এগিয়ে বলেছেন, আইন প্রণয়নে পুরোপুরিভাবে কোরআনের বিধান অনুসরণ করা উচিত।[২৭] শরীয়াহকে সংবিধানের একটি অনুচ্ছেদ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার যে বিশেষ কোনো প্রয়োজন নেই, আন নাহদার রক্ষণশীল এক্টিভিস্টদেরকে তা বুঝাতে চেষ্টা করেছিলেন দলটির বিশিষ্ট নেতা রিয়াদ শাইবি। যিনি পরে পদত্যাগ করেছেন। সে কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, "তাদেরকে বুঝানো ছিল দুঃসাধ্য। এতে কেউ কেউ এতটা ক্রুদ্ধ হতেন, যা প্রায় ঘৃণার পর্যায়ে চলে যেতো।"[২৮]

তবে ঘানুশীর ক্যারিশমা ও দূরদর্শিতার ফলে দলটির নেতৃবৃন্দ সঠিক পথেই এগিয়েছে। শরীয়াহর উপর গুরুত্বারোপ করলে কেন অনাহুত হাঙ্গামা তৈরি হতে পারে, সেই ব্যাপারটি তারা তাদের জনশক্তির কাছে ব্যাখ্যা করেছে। দলীয় শৃঙ্খলা ঠিক রাখার দিকে মনোযোগ দিলেও আন নাহদা বৃহত্তর সমাজের নিকট শরীয়াহর ব্যাপারে নিজেদের অবস্থান ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে কম মনোযোগ দিয়েছে। এর ফলে দলটির প্রকৃত উদ্দেশ্য নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। আবার তাদের নিকট যখন বৈপ্লবিক দাবি-দাওয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, তখনো তাদেরকে একই ধরনের সমস্যায় পড়তে দেখা যায়। ২০১৩ সালে মাত্র এক ভোটের ব্যবধানে প্রস্তাবিত 'এক্সক্লুশন ল' সংসদে পাশ

---

[২৬] Duncan Pickard, "The Current Status of Constitution Making in Tunisia," Carnegie Endowment for International Peace, April 19, 2012, http://carnegieendowment.org/2012/04/19/current-status-of-constitution-making-in-tunisia.

[২৭] "Tunisian Confidence."

[২৮] লেখকের সাথে আলাপচারিতা, রিয়াদ শাইবি, ফেব্রুয়ারি ১০, ২০১৫।

হতে পারেনি। এই আইন পাশ হলে ১৯৮৭ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত বেন আলী সরকারে কর্মরত সকল কর্মকর্তার পাশাপাশি পূর্ববর্তী শাসক দলের সকল সিনিয়র সদস্যসহ তিউনিশিয়ার হাজার হাজার মানুষের উপর সরকারী পদে বহাল থাকার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ হয়ে যেত।[২৯] এই বিল ঠেকানোর লক্ষ্যে আন নাহদার প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রতিনিধি যেন সর্বশেষ মিনিটে তাদের ভোট প্রদান করে, এ বিষয়ে রাজি করাতে ঘানুশী তার মূল্যবান রাজনৈতিক পুঁজির অনেকটা ব্যয় করেছেন। যে কোনো সংগঠনেরই সামর্থ্য থাকে সীমিত। তারপরেও বাস্তবতা হলো অভ্যন্তরীণ বিতর্কের সমাধান করতেই দলের রাজনৈতিক সামর্থ্যের অনেকটা খরচ হয়ে যায়।

যেসব ইসলামপন্থী আন্দোলন প্রতিনিয়ত নতুন নতুন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়, সে দলগুলোর মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণভাবে কাজ করার ক্ষমতাসম্পন্ন দলের সর্বোচ্চ একটি উদাহরণ হলো আন নাহদা। সেকুলার এলিট, নানাবিধ আন্তর্জাতিক শক্তি কিংবা কৌতুহলী যে কারো কাছে এই আন্দোলনগুলোকে নিশ্চিতভাবে 'মধ্যপন্থী' বলে মনে হবে। আবার, তাদের রক্ষণশীল অংশ এক ধরনের আত্মপরিচয়, মতাদর্শ ও ধর্মীয় মান বজায় রাখতে চায়। সেটি সম্ভব না হলে অন্ততপক্ষে এ ব্যাপারগুলোকে আন্দোলনের 'চেতনা' হিসেবে ধরে রাখতে চায়। দুই কূল রক্ষার এই অন্তহীন প্রচেষ্টা এক ধরনের আত্মপরিচয়ের সংকট তৈরি করে। একজন সিভিল সোসাইটি অ্যাক্টিভিস্ট আমাকে বলেছেন, "আন নাহদা অন্য কারো মতো নয়। এমনকি, অন্যরা তাদের ব্যাপারে যা অনুমান করে, তারা তেমনও নয়।"[৩০] ২০১৫ সালের এপ্রিলে একজন ফরাসী সাংবাদিকের সাথে সাক্ষাৎকারে ঘানুশী নিজেকে একটি ঝুলন্ত রশির উপর দিয়ে হাঁটা ব্যক্তির সাথে তুলনা করেছেন। ব্লাসফেমির বিরুদ্ধে ইসলামপন্থীদের গতানুগতিক অবস্থান এবং উত্তরাধিকার ও জেন্ডার সমতার ব্যাপারে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গিই তিনি বার বার আওড়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে সমকামীদের ব্যাপারে তিনি সহনশীলতা দেখিয়েছেন। এ ব্যাপারে তার যুক্তি হলো, 'কোনো ব্যক্তির উপর গোপনে নজরদারি' করার কথা ইসলাম বলে না।[৩১]

---

[২৯] Human Rights Watch, "Tunisia: Sweeping Political Exclusion Law," June 15, 2013, http://www.hrw.org/news/2013/06/15/tunisia-sweeping-political-exclusion-law.

[৩০] লেখকের সাথে আলাপচারিতা, একজন সিভিল সোসাইটি এক্টিভিস্ট, ফেব্রুয়ারি ৬, ২০১৫।

[৩১] Ursula Lindsey, "Tunisia's Rachid Ghannouchi on Blasphemy, Homosexuality, Equality," Arabist, April 6, 2015,

আন নাহদার এই মধ্যপন্থী অবস্থান কতটা 'কৌশলগত' এবং কতটা খাঁটি আদর্শিক বিবর্তনের ফসল? তিউনিশিয়ার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, অর্থাৎ দুর্বল পরিবর্তন প্রক্রিয়া ও দমনপীড়নের নেতিবাচক ফলাফলের দিকে যদি নজর দেই, তাহলে আন নাহদার সতর্ক পদক্ষেপ ও সমঝোতার নীতিকে আমরা সহজে বুঝতে পারবো। এই অতীত অভিজ্ঞতার কারণেই তাদের বিশ্বাস ও কাজের মধ্যে সম্পর্ক খুব কম। এটি নিশ্চিত, বিশ্বাস কর্মকে প্রভাবিত করে। কিন্তু দীর্ঘসময় ধরে কোনো কিছু ক্রমাগত বলতে থাকলে এবং করতে থাকলে তা উল্টোভাবে আপনার বিশ্বাসকেই পরিবর্তন করে ফেলতে পারে। যদিও শুরুতে আপনি এ ব্যাপারে মোটেও সচেতন থাকেন না।

আন নাহদার নেতৃবৃন্দের মধ্যে যারা নীতি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অনড় বা কঠোর মনোভাবসম্পন্ন, তাদের মাঝে শায়খ হাবিব আল লাউজ অন্যতম। দলটির ইসলামী পরিচয় যেন অক্ষুন্ন থাকে, সে জন্য তিনি নিজ উদ্যোগে এক ধরনের অভিভাবকের ভূমিকা পালন করেন। দলটি দিন দিন আপসের দিকে এগিয়ে যাওয়ায় তিনি উদ্বিগ্ন। ১৯৮০'র দশকের শেষ দিকে আন্দোলনটি যখন নিজের নাম 'হারাকাত আল ইতিজাহ আল ইসলামীর' পরিবর্তে 'আন নাহদা' গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়, তখনো তিনি এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলেন। দুই দশক পর এখনো তিনি একই ধরনের সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে সংসদীয় অধিবেশনের একটা উত্তেজনাপূর্ণ সময়ে আমি আল লাউজের সাথে প্রথমবারের মতো দেখা করি। আন্দোলনটির এই অন্যতম ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব এখন বেশ বৃদ্ধ। তের বছরের নির্জন কারাবাসকালে তার একটি চোখ অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাকে দেখতে বিশ বছরের প্রাণবন্ত যুবকের মতোই মনে হচ্ছিল। ইতিহাস নিজের পক্ষে ছিল বলে বিশ্বাসী কোনো ব্যক্তি যেভাবে আত্মবিশ্বাসের সাথে কথা বলে, তিনি সেভাবেই কথা বলছিলেন। নিছক কৌশল হিসেবে মধ্যপন্থার দিকে দলের এগিয়ে যাওয়াকে তিনি নাকচ করে দেন। তিনি আমাকে বলেছেন, "আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যিনি শরীয়াহ আইনে বিশ্বাস রাখেন না। আমাদের সবাই বিশ্বাস করে, একদিন মদ নিষিদ্ধ করা হবে। আমাদের ইসলামী আইডিয়াগুলো সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে কীভাবে তুলে ধরা যায়, সেটা নিয়েই কেবল আমাদের মতদ্বৈততা।"[৩২]

দুই বছর পর যখন তার সাথে আমি আবার দেখা করলাম, তখন তিনি আগের মতো নিঃশঙ্ক ছিলেন না। এই দুই বছরে অনেক কিছু পরিবর্তিত হয়ে গেছে। তিনি যে

---

http://arabist.net/blog/2015/4/6/tunisias-rachid-ghannouchi-on-blasphemy-homosexuality-equality.

[৩২] লেখকের সাথে আলাপচারিতা, হাবিব আল লাউজ, ফেব্রুয়ারি ১৪, ২০১৩।

অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছেন, তা বুঝতে পারছেন। তিনি আমাকে আন নাহদার সদর দপ্তরে দেখা করতে বলেছিলেন। কিন্তু সেখানে তো প্রায় সবাই তার থেকে ভিন্ন চিন্তাধারা পোষণ করে। তাই আমি ভাবলাম, তিনি যেহেতু দলের নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সাথে আসলেই মানিয়ে নিতে পারছেন না, তাই সেখানে তার সাথে দেখা করাটা উচিত হবে না। সদর দপ্তরের কর্মকর্তাদের অধিকাংশই তরুণ। যাদের কমন পোশাক হলো সাদা শার্ট, কালো স্যুট, মানানসই চিকন কালো টাই। যেন আমরা একটি ফ্যাশন শুট সেশনে এসে পড়েছি– স্যুটগুলো চোখে পড়ার মতো সুন্দর করে বানানো এবং পরনের প্যান্টগুলো বেশ সরু। অন্যদিকে, আল লাউজ পরিধান করেন ঐতিহ্যবাহী জোব্বা, মাথায় থাকে লাল পশমি টুপি (তিউনিশিয়ায় এটি 'শাশিয়া' নামে পরিচিত)। যা হোক, আমরা একটি বড় কনফারেন্স রুমের এক প্রান্তে বসলাম। কিন্তু কিছু লোক সেখানে উচ্চস্বরে কথাবার্তা বলছিল। আন্দোলনটির একজন ঐতিহাসিক নেতা যে এখানে বসে সাক্ষাৎকার দেয়ার চেষ্টা করছেন, তারা তা খেয়ালই করছিল না। ফলে স্টাফদেরকে তিনি একটি শান্ত রুমের ব্যবস্থা করতে বললেন। কিছুক্ষণ পর আমরা এই পাঁচতলা ভবনটির টপ ফ্লোরের একটি ছোট রুমে স্থানান্তরিত হই।

দ্বিমত পোষণ করলেও আল লাউজ সবসময় দলের প্রতি অনুগতই ছিলেন। কিন্তু এবার তিনি দলের ব্যাপারে তার খোলামেলা ও ছাঁচাছোলা সমালোচনা তুলে ধরলেন। তিনি সমালোচনাগুলোর একটা তালিকা দিলেন এবং একে একে সবগুলো নিয়ে বিস্তারিত বললেন। প্রথমত, কর্মকর্তাদের তৈরি করা দায়সারা, সাদামাটা ও রেডিমেড প্রচারণায় সীমাবদ্ধ থাকলে নির্বাচনে হেরে যাওয়াই তো আন নাহদার জন্য স্বাভাবিক ব্যাপার। তিনি আরো বলেছেন, সেকুলারদের কাছে পৌঁছানোর যত চেষ্টাই আপনি করেন, তারা সবসময় আপনাকে সন্দেহ করবে।[৩৩] তবে নির্বাচনী কৌশল নিয়ে মতদ্বৈততার ব্যাপারটি আরো জটিল। নির্বাসিত অবস্থায় যারা বড় হয়েছে কিংবা আন্দোলনের সংস্পর্শ যারা পায়নি, সেসব তরুণরা দলের নেতৃত্বে চলে আসায় তিনি উদ্বিগ্ন। তার মতে, এটাকে কৌশল হিসেবে নিলেও অচিরেই এর জন্য মূল্য দিতে হবে। আপনি যদি বার বার কোনো কিছু বলতে থাকেন, তাহলে এক পর্যায়ে আপনি তা বিশ্বাসও করতে শুরু করবেন। তবে দিন শেষে কেউই মনে করছে না যে, তারা 'ডবল ডিসকোর্সে' লিপ্ত আছে (আন নাহদার বিরোধীরা সবসময় এই অভিযোগই করে থাকে)। আপনি যা প্রকাশ্যে বলেন ও করেন এবং আপনি যা বিশ্বাস করেন– এ দুইয়ের মাঝখানে ব্যবধান কমিয়ে আনতে হলে আপনাকে সম্ভবত আপনার বিশ্বাসের দিকেই ফিরে যেতে হবে। এখন কেউ বলতে পারে, এটাই তো রাজনীতির মূলকথা। (আবার এটি বিপরীতভাবেও সত্য হতে পারে। অর্থাৎ, নির্বাচনী রাজনীতির

[৩৩] লেখকের সাথে আলাপচারিতা, হাবিব আল লাউজ, ফেব্রুয়ারি ১০, ২০১৫।

সুবিধার জন্য 'মধ্যপন্থীরা' বেশি বেশি রক্ষণশীল ধ্যানধারণার কথা বলে থাকতে পারে এবং সময়ের ব্যবধানে, তাদের ব্যবহৃত এইসব রেটরিক তারা নিজেরাই বিশ্বাস করা শুরু করতে পারে।)

আন নাহদা যে 'ব্যতিক্রমধর্মী' এবং অত্যন্ত প্রগতিশীল একটি ইসলামপন্থী দল, এর একটি নিদর্শন হলো দলটি নানা মতের ব্যক্তিদেরকে নেতৃত্বে স্থান দিয়েছে। তাদের এই আত্ম-উপলব্ধি তাদেরকে সমাজের মূলধারায় পরিচালিত করেছে। এর ফলে তাদের রক্ষণশীল অংশ অসন্তুষ্ট হলেও যথেষ্ট নাড়া খেয়েছে। 'আমরা গর্বিত'– এই কথাটা তাদের মুখে আমি অনেকবার শুনেছি। 'ইসলাম ও গণতন্ত্রের মধ্যে সমন্বয় সম্ভব'– সন্দেহবাদী সেকুলারসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিকট এই বক্তব্য তুলে ধরে নিজেদের প্রতি আরোপিত অভিযোগকে ভুল প্রমাণ করার মধ্যে নিশ্চয় এক ধরনের ভালো লাগা কাজ করে।

এর পাশাপাশি ব্যক্তিও গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য ইসলামপন্থী আন্দোলনে বড় মাপের চিন্তাবিদ বা তাত্ত্বিকের অভাব রয়েছে। গত কয়েক দশকে মিশরের ব্রাদারহুডে এমন কেউ নেই। অন্যদিকে, আন নাহদার ক্ষেত্রে রশিদ ঘানুশীর মতো বড় মাপের একজন তাত্ত্বিক রয়েছেন। যিনি দলটির জন্য একটি স্বতন্ত্র ভিশন দাঁড় করিয়েছেন। তুর্কি মডেলকে আন নাহদার অনুপ্রেরণার বড় উৎস মনে করা হলেও একেপির সাথে আন নাহদার স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এই দুই পার্টির মতাদর্শিক মিলের জায়গাটি হলো– উভয় দলই ব্রাদারহুড ঘরানার নমনীয় এবং অধিক সেকুলারবান্ধব একটি ধারা। এরদোয়ান হচ্ছেন ইস্তাম্বুলের তৃণমূল থেকে উঠে আসা একজন দক্ষ রাজনীতিবিদ। তিনি তার ধর্মীয় পরিচয়ে ফিরে গেছেন। কারণ, কিছু ক্ষেত্রে এটি কাজ দিয়েছে। অন্যদিকে ঘানুশী হলেন একজন ইন্টেলেকচুয়াল। তাই নির্বাচনে জেতার চেয়েও তার কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো নিজের অবস্থানকে সঠিক প্রমাণ করা। কিন্তু অনুসারীরা ব্যাপারটির গুরুত্ব অনুধাবন করার আগেই হয়তো দলীয় প্রধান হিসেবে কয়েকটি নির্বাচনে তিনি হেরে যেতে পারেন। ঘানুশীর জীবনী লেখক আজ্জাম তামিমী (যিনি নিজেও হামাসের সাথে সংশ্লিষ্ট একজন সুপরিচিত ইসলামপন্থী) আমাকে এ ব্যাপারে বলেছেন, "ঘানুশী নিজেই বিভিন্ন সময় স্ববিরোধী কাজ করেছেন। কারণ, একজন ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে তিনি একভাবে চিন্তা করেছেন, কিন্তু একই সময়ে রাজনীতিবিদ হিসেবে তাকে ভিন্নভাবে কাজ করতে হয়েছে। এই দুইয়ের মধ্যে সবসময়ই একটা টানাপড়েন রয়ে গেছে।"[৩৪]

[৩৪] লেখকের সাথে আলাপচারিতা, আজ্জাম তামিমী, ফেব্রুয়ারি ২, ২০১৫।

কিছু বিষয় বিবেচনায় ঘানুশীর ভিশন হয়তো স্বতন্ত্র একটা কিছু। তবে তিউনিশিয়ার রাজনীতির বাস্তবতায় তার পদক্ষেপের ফলাফল সবসময় সঙ্গতিপূর্ণ বা সুস্পষ্ট নয়। আন নাহদা কি একটি বিপ্লবী দল, নাকি সংস্কারপন্থী? উল্লেখ্য, আগের মতো দলটির বিপ্লবী চরিত্র অক্ষুন্ন নেই– এই অভিযোগ তুলে ইতোমধ্যে বেশ কয়েকজন সুপরিচিত নেতা দল ত্যাগ করেছেন। দলটি মন্ত্রী পরিষদের একটি পদ গ্রহণ করায় তারা কি সরকারী দল, নাকি বিরোধী দল; নাকি একই সাথে উভয়ই? আন নাহদা কি একটি আন্দোলন, নাকি পার্টি; নাকি উভয়টিই? যদি উভয়টিই হয়, তাহলে তা কি টেকসই হবে? দলটি নিজেই যখন ধর্মীয় রেফারেন্সের গুরুত্ব কমিয়ে দিচ্ছে, সেখানে 'এটি এমন একটি দল, ধর্মীয় রেফারেন্স যার ভিত্তি' এ কথার মানে আসলে কী?

আন নাহদা এবং ইসলামিস্ট এক্সেপশনালিজমের সমস্যা

দশকের পর দশক ধরে চাপিয়ে দেয়া সেকুলারাইজেশনের অবসানের দ্বারপ্রান্তে এসে তুরস্কের মতো তিউনিশিয়াও পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি তাৎপর্যপূর্ণ ক্ষেত্র হয়ে ওঠেছে। দেশটির সেকুলার প্রেক্ষাপটে ইসলামের পুনর্জাগণের তৎপরতা কীভাবে সাধিত হচ্ছে? ঘানুশীর পরিকল্পনা ছিল ইসলামপন্থা, এমনকি সম্ভবত 'ইসলামের' মধ্যেও (ইসলাম ও ইসলামপন্থা– এ দুটিকে পরস্পর সম্পর্কিত ধরে নিয়ে) পরিবর্তন আনা। এটি করতে গিয়ে তিনি তার পুরো জীবনের অর্জনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন। তার চিন্তা ছিল ইসলাম ও ইসলামপন্থাকে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারলে মতাদর্শিক বিভাজন থেকে বেরিয়ে আসা যাবে। এটি খুবই দারুণ চিন্তা ছিল। বহুকাল পূর্বে ঐক্য ও সংহতির মূল সূত্র ছিল ইসলাম। কিন্তু ইসলামপন্থা এসে একে রাজনৈতিকীকরণ করেছে। এটা ইসলামপন্থার অন্যতম বড় ব্যর্থতা (কিংবা, সফলতা। এটি নির্ভর করে আপনার দৃষ্টিভঙ্গির উপর)।

ঘানুশীর বন্ধু ও সমমনা আব্দুল মোনায়েম আবুল ফুতুহ স্পষ্টত এই কারণেই মিশরের মুসলিম ব্রাদাহুড থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। ২০১২ সালে প্রেসিডেন্ট পদের জন্য বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে প্রচারণার সময় তিনি একটি সালাফী টিভি চ্যানেলের সাথে সাক্ষাৎকারে ঘোষণা করেছিলেন, 'বর্তমানে যারা নিজেদেরকে লিবারেল কিংবা বামপন্থী হিসেবে দাবি করে, তাদের অধিকাংশই ইসলামী মূল্যবোধকে মেনে চলে ও সম্মান করে। এটা নিছক একটি রাজনৈতিক পরিচয় মাত্র। তারা শরীয়াহ সমর্থন

করে এবং কখনোই এর বিরোধিতা করে না।"[৩৫] আবুল ফুতুহর মতে, এক দৃষ্টিতে সকল মুসলমানই সালাফী। যেহেতু সবাই ইসলামের প্রাথমিক যুগের একনিষ্ঠ মুসলিম তথা সালাফদের অনুসরণ করে থাকেন। যেন তিনি বলতে চাচ্ছেন, কার্যত আমরা সকলেই তো ইসলামপন্থী, তাহলে কেন আমরা এ নিয়ে মতবিরোধে লিপ্ত?

মতবিরোধ হওয়ার যথেষ্ট কারণ নিশ্চয় ছিল। তাই একটি মধ্যপন্থী অবস্থানে যাওয়ার জন্য আন নাহদা যতই চেষ্টা করুক না কেন, দিন শেষে দলটির পরিচয় আন নাহদাই রয়ে গেছে। যদি আন নাহদা এই পরিচয় ত্যাগ করে একটি 'লিবারেল' দলে পরিণত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে কী ঘটবে? আপাতদৃষ্টিতে হয়তো মনে হবে, একটি ইসলামপন্থী দলের চেয়ে বিদ্যমান অন্যান্য লিবারেল দলগুলোই লিবারেল হিসেবে ভালো। যদিও ঘানুশী অনেক বেশি উদারতা দেখাতে রাজি।[৩৬] আন নাহদা আগের পরিচয় থেকে সরেও আসলেও অন্য কেউ এসে সেই শূন্যস্থান ঠিকই পূরণ করে নেবে। যতদিন পর্যন্ত একটি পরিপূর্ণ ইসলামী রাজনীতির আবেদন থাকবে, ততদিন কেউ না কেউ তা পূরণ করে চলবে।

তবে এখানে আরেকটা সমস্যা আছে। কথা ও কাজে আন নাহদা সম্ভবত ঠিকই আছে, কিন্তু তারপরও সন্দেহ থেকেই যায়। আর ব্যাপারটা এমন কিছুও নয়, যার উপর দলের নেতাদের নিয়ন্ত্রণ আছে। অন্যদিকে, ইসলামপন্থীরা ইসলামপন্থী হওয়ার কারণেই সেকুলাররা ইসলামপন্থীদেরকে ঘৃণা বা অবিশ্বাস করে। ইসলামপন্থীরা বাস্তবে কী করে, সেটা তাদের বিবেচ্য বিষয় নয়। এটা সত্য যে, আন নাহদার সংস্পর্শে এসে লোকজন রক্ষণশীল প্র্যাকটিসিং মুসলিম হিসেবে গড়ে ওঠে। যেমন, কোনো মিটিংয়ের আগে বা পরে দলীয় নেতৃবৃন্দ সাধারণত জামায়াতের সাথে নামাজ আদায় করে। ইসলাম হলো তাদের শুরুর পয়েন্ট, এমনকি শেষ পয়েন্টও বটে। তবে এর মাঝখানে কোনো বিষয়ে তারা যা কিছু বলে, সেগুলো নিয়ে তাদের মাঝে বেশ মতদ্বৈততা রয়েছে।

ঘানুশীর সাথে সাক্ষাৎ শেষে তার সহকারী আমাকে খুব সম্মানের সাথে পরবর্তী মিটিংয়ে পৌঁছে দিয়েছিলেন। দেখেই মনে হয়েছে এই ব্যক্তি অত্যন্ত পরহেজগার।

---

[৩৫] See Abdel Moneim Abul Futouh, interview, February 5, 2012, YouTube, http://www.youtube.com/watch?v=hgWJRuVOyDc&list=UUQpLme0GRI0L8MRC_d2aSrA&index=9&feature=plcp&fb_source=message.

[৩৬] আন নাহদার অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মতো রশিদ ঘানুশী নিজেকে 'ইসলামপন্থা' কিংবা 'ইসলামপন্থী' থেকে আলাদা করেননি। তিনি নিজেকে বৃহত্তর 'ইসলামী আন্দোলনের' একজন নেতা হিসেবেই বিবেচনা করেন।

আন্দোলন ও শায়খের (আন নাহদার কর্মীরা ঘানুশীকে শ্রদ্ধার সাথে 'শায়খ' বলে সম্বোধন করে) নেতৃত্বের উপর স্থাপিত গভীর আস্থার উপর ভিত্তি করেই এই সহকারী জীবন সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলেছেন বলে মনে হলো। নীরবতার কারণে গাড়ির ভেতর একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। পরিবেশটাকে হালকা করতে আমি আলাপ শুরু করার চেষ্টা করলাম। শীঘ্রই আমরা আলাপে মগ্ন হয়ে পড়লাম। এক পর্যায়ে জানতে চাইলাম, মদ্যপায়ী কোনো ব্যক্তি আন নাহদায় যোগ দিতে পারে কিনা। এ ধরনের প্রশ্নের জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। যা হোক, তিনি দলের সদস্য হওয়ার শর্তগুলো বিস্তারিতভাবে জানালেন। সদস্যপ্রার্থীর নৈতিক চরিত্রের ব্যাপারে কাউকে সাক্ষ্য দিতে হয়। এই প্রক্রিয়াটি 'তাজকিয়া' হিসেবে পরিচিত। মদ পানকারী কোনো ব্যক্তি প্রথম সুযোগেই আন নাহদার সদস্য হয়ে যাবে, এমনটা অসম্ভব প্রায়। অবশ্য কেউ যদি মদ পান ছেড়ে দিয়ে ভালো মুসলমান হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে, তাহলে সম্ভবত তার পক্ষে দলে যোগদান করা সম্ভব।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বলা যায়, একটি আধুনিক দলের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও আন নাহদা যথেষ্ট আধুনিক নয়। বরং অনেকটা পরিবারের মতো। আন নাহদার সাবেক নেতা রিয়াদ শাইবি আমার কাছে ব্যাপারটা বর্ণনা করেছেন এভাবে, "দল ত্যাগ করাকে অনেকটা ধর্মত্যাগের মতো ব্যাপার হিসেবে দেখা হয়।"[৩৭] অধিকাংশ ইসলামপন্থী দলের মতো আন নাহদাও 'শুমুলি', অর্থাৎ সবার্থকবাদী ধারার দল। ব্রাদারহুড ঘরানার সংগঠনগুলোর প্রাথমিক পরিচয় হলো, এরা দল নয়, মূলত আন্দোলন। এর মানে হলো, এটি জীবনের সকল দিককে পরিবেষ্টন করে আছে। এই সংগঠনগুলো ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করে এবং নানা ধরনের সাহায্য-সহায়তামূলক কাজকর্ম করে থাকে। সংগঠনের সদস্যরা যখন সমাজে একঘরে হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ভোগে, সংগঠন তখন তাদেরকে ভ্রাতৃত্ববোধ ও গোষ্ঠীবদ্ধতার চেতনায় আবদ্ধ করে। সম্ভবত এটাই এই সংগঠনগুলোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। রাষ্ট্র শক্তিশালী হয়ে ওঠলে এবং সমাজ দুর্বল হয়ে পড়লে যে ধরনের শূন্যতা তৈরি হয়, তা পূরণে তারা এগিয়ে আসে। স্বৈরাচারী শাসনামলে তাদের কোনো কর্মী যখন অন্যায়ভাবে জেল খাটে, তখন ওই কর্মীর পরিবারকে তারা প্রয়োজনীয় আর্থিক, আইনগত ও নৈতিক সাপোর্ট দিয়ে থাকে।

একাডেমিকরা সঙ্গত কারণেই ইসলামপন্থীদের ময়দানের তৎপরতার দিকে মনোযোগী হয়েছেন। হ্যাঁ, দৃশ্যমান তৎপরতা পর্যবেক্ষণ করা সহজ। এটাকে আপনি মূল্যায়ন করতে পারেন। এটা বোধগম্য ব্যাপার। কিন্তু ইসলামপন্থীদের প্রকৃত পরিচয়

[৩৭] লেখকের সাথে আলাপচারিতা, রিয়াদ শাইবি, ফেব্রুয়ারি ১০, ২০১৫।

কী, তার উপর ফোকাস করা বেশ কঠিন। কারণ, একজন ব্যক্তির মনের খবর কখনোই সত্যিকার অর্থে জানা যায় না। এর মানে হলো, ইসলামপন্থী সংগঠনগুলো যে ধরনের লোক তৈরি করছে, তার পরিবর্তে আমরা কেবল কিছু নির্দিষ্ট টার্ম বা রেটরিক বিশ্লেষণ করেই এসব সংগঠনকে বুঝার চেষ্টা করি। যদিও এসব সংগঠনের ব্যাপারে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা রয়েছে, তারপরও তাদের 'সর্বাত্মকবাদী' বৈশিষ্ট্য ('encompassing' nature) অনালোচিত রয়ে গেছে। এই সংগঠনগুলোর ব্যাপারে যেসব উপসংহার টানা হয়, আসলে তারা এরচেয়েও বেশি কিছু। তারা একটি আন্দোলন। তাদের সদস্যপদ গ্রহণের গভীর তাৎপর্য রয়েছে। এই সংগঠনগুলোর সদস্যপদের কাঠামো সাধারণত ক্রমসোপনমূলক হয়ে থাকে। বিশেষত ব্রাদাহুড ঘরানার সংগঠনগুলোর ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে সত্য। যা হোক, আন নাহদা হলো একের ভেতর দুই, অর্থাৎ একইসাথে দল ও আন্দোলন। তাই দলটিতে কেউ যোগ দিতে চাইলে তাকে আগে আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গিকে মেনে নিতে হয়। আইনী বাধ্যবাধকতার কারণে সরকার অনুমোদিত দলগুলোতে যে কেউ যোগ দিতে পারে। সেদিক থেকে যে কেউ আন নাহদায়ও যোগ দিতে পারে। অন্তত তাত্ত্বিকভাবে এটি সত্য। কিন্তু আন নাহদা কিংবা অন্য যে কোনো বড় মাপের ইসলামপন্থী দলের বাস্তব অবস্থান এর থেকে ভিন্ন। আন নাহদার টিপিক্যাল সদস্যদের ব্যাপারে বলতে গিয়ে রিয়াদ শাইবি বলেছেন, "তারা নিজেদেরকে সমাজের অংশ মনে করে না। তারা মনে করে, তারা হলো উত্তম। এই ধারণা তাদেরকে আত্মতুষ্টির দিকে নিয়ে যায়। তারা তখন ভাবে, 'আমরা নিছক জাতির সদস্য মাত্র নই... আমরাই হলাম জাতির বিবেক।'

এমনকি আন নাহদার সবচেয়ে প্রাগ্রসর ব্যক্তিরাও প্রচ্ছন্নভাবে মনে করেন, ব্যক্তি হিসেবে তারা অন্যদের চেয়ে আলাদা। তারা অনেক কিছু করেছে এ জন্য নয়, বরং নিজেদের সম্পর্কে তাদের যে ধারণা সে কারণেই তারা এমনটি ভাবে। এ ব্যাপারে ঘানুশীর ঘনিষ্ট সহযোগী নুরুদ্দীন আরবাউয়ীর সাথে আমার আরো কিছু ইন্টারেস্টিং কথাবার্তা হয়েছে। ধর্মের গুরুত্বকে কমিয়ে দেশের সবচেয়ে দক্ষ লোকদের নিয়ে আন নাহদাকে নতুন করে সংগঠিত করার মাধ্যমে দলটির যে নতুন পরিচয় দাঁড়িয়েছে, তিনি এর প্রবল সমর্থক। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান প্রশ্নে অন্য যে কোনো সেকুলার দল থেকে আন নাহদাকে কেউ বেশি দক্ষ মনে করবে কেন, যেখানে সেকুলার দলগুলোতে আরো বড় বড় অর্থনীতিবিদ রয়েছে এবং সরকার পরিচালনার অভিজ্ঞতাও তাদের বেশি? তখন তিনি স্বীকার করেন, "আন নাহদা, নিদা তিউনেস কিংবা অন্যান্যদের কর্মসূচির মধ্যে মিল রয়েছে, এটা সত্য। তাহলে আমরা এমন কী করলাম, যার জন্য নাগরিকরা আন নাহদাকে ভোট দেবে? এরদোয়ানের মতো বলতে চাই, আমরা চুরি করি না।"

বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি ২০০৬ সালের নির্বাচনে ফিলিস্তিনীরা ফাতাহর পরিবর্তে হামাসকে কেন ভোট দিয়েছিল, সেই উদাহরণ তুলে ধরেন:

হামাস যখনই কোনো কর্মসংস্থানমূলক প্রজেক্টের জন্য তহবিল সংগ্রহ করতে পেরেছে, তার শতকরা ৯০ টাকাই প্রাপ্য ব্যক্তিরা পেয়েছে। বড়জোর ১০ টাকার দুর্নীতি হয়তো হয়েছে। কিন্তু আপনি যদি একই প্রজেক্টের জন্য এই একশ টাকা ফাতাহকে দিতেন, তাহলে ৯০ টাকাই দুর্নীতির কারণে নষ্ট হয়ে যেত।[৩৮]

আমার কাছে মনে হয়েছে, আরবাউয়ী পাশ্চাত্যের লোকদেরকে কথা বিবেচনায় রেখে এভাবে চিন্তা করেছেন। ইসলামপন্থীদের ব্যাপারে লোকদের মনে যদি কোনো ভীতি থেকে থাকে, তা যেন দূর হয়। যেন ইসলামপন্থীরা পুরোপুরি সেকুলারদের মতোই, বরং তাদের চেয়েও ভালো। কারণ তারা কম দুর্নীতিগ্রস্ত। নিছক সৎ থাকা এবং একটি চমৎকার অর্থনৈতিক কর্মসূচি হাজির করাই রাজনীতিবদদের জন্য যথেষ্ট, বাকি সবকিছু অন্যদের মতোই চলবে– তারা সত্যিই যদি এমনটি ভেবে থাকে, তাহলে তা নিছক সরলতা মাত্র। কিন্তু আরবাউয়ীর মন্তব্য শুনতে যত নির্দোষই মনে হোক না কেন, এটা ইসলামপন্থীদের ধর্মীয় কমিটমেন্টের পরিপন্থী। কারণ, ইসলামপন্থীরা শুধু ভালো মানুষই নয়, ভালো রাজনীতিবিদ হওয়ার ব্যাপারেও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এর মানে হলো, ইসলামপন্থী দলগুলো নিজেদেরকে যে ধরনের 'স্বাভাবিক' দল হিসেবে দাবি করে, শতভাগ আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও তারা কখনোই তেমনটি হতে পারবে না।

যা হোক, স্বৈরাচারী শাসনামলে এই ধরনের প্রবণতা থাকাটা খুব একটা সমস্যাজনক নয়। কিন্তু ইসলামপন্থীদের কাঁধে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব এসে পড়ার পর এটা নিশ্চয় একটা ইস্যু। প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণত সরকারী দলগুলোর পক্ষে প্রভাব বিস্তারসহ নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধার পথ খোলা থাকে। কিন্তু এর সুযোগ নিয়ে আপনি যদি ক্ষমতা কেন্দ্রে একটি বিশেষ ধর্মীয় কিংবা নৈতিক প্রাধান্য তৈরি করতে চান, তাহলে এক ধরনের গণবিচ্ছিন্নতা (perception of exclusion) তৈরি হতে পারে। তিউনিশিয়ায় আন নাহদা ও মিশরে ব্রাদারহুড অল্প যে কয়েকদিন ক্ষমতায় ছিল, সে সময় নন-ইসলামিস্ট শিবিরে এ রকম ধারণাই ছড়িয়ে পড়েছিল। তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রকে 'ব্রাডারহুডকরণের' অভিযোগ জোরালো হয়ে উঠেছিল। বিরোধীদের এই দাবি অনেক বেশি অতিরঞ্জিত হলেও তারা ছিল বরাবরই সক্রিয়। তাদের মধ্যে ভেতরে ভেতরে এমন ভীতি কাজ করেছে যে, ইসলামপন্থীরা অত্যন্ত গোঁড়া। তাদেরকে কিছু শোনানো যায় না। তারা অন্য যে কিছুর চেয়ে সাংগঠনিক স্বার্থকে বেশি গুরুত্ব দেয়। যে কোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলো

[৩৮] লেখকের সাথে আলাপচারিতা, নুরুদ্দীন আরবাউয়ী, ফেব্রুয়ারি ১১, ২০১৫।

দলের সদস্যদেরকে উচ্চ পদগুলোতে নিয়োগ দিয়ে থাকে। কিন্তু একটি রক্ষণশীল আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিষয়টি একটু অন্য রকম। কেননা, এ ধরনের আন্দোলন দলীয় ব্যবস্থাকে ছাড়িয়ে যায়। তারা নিজেদের এমন সদস্যদেরকেই নিয়োগ দান করে, যারা সামষ্ঠিকভাবে আনুগত্যের সুগভীর বন্ধনে আবদ্ধ।

উপরের এই সমস্যাগুলো আধুনিকীকরণের সাথে সম্পর্কিত। এই আধুনিকীকরণ ঠিক কেমন? আসলে এটা এক ধরনের জগাখিচুড়ি। একটি একক শক্তি হিসেবে ইসলামের যে প্রাক-আধুনিক ধারণা, তা রাজনৈতিক দল সংক্রান্ত আধুনিক ধারণার সাথে ঠিক খাপ খায় না। রাজনৈতিক দল এবং জাতিরাষ্ট্র এখন অবিচ্ছেদ্যভাবে পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। মোটকথা, এখন একটা রাষ্ট্র থাকে, যাকে একটা সরকার পরিচালনা করে এবং এই পরিচালনার সুযোগ লাভের জন্য রাজনৈতিক দলগুলো প্রতিযোগিতা করে থাকে। রাষ্ট্র যত বেশি শক্তিশালী, ক্ষমতার জন্য লড়াইও তত বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। তবে আমলাতন্ত্র ও নিরাপত্তা খাতের উপর মাত্রাতিরিক্ত নির্ভরতা, বিশাল সংখ্যক নির্ভরশীল নাগরিকদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান ও কর্মসংস্থানের বোঝা কাঁধে থাকলে শক্তিশালী কোনো রাষ্ট্রও চরম দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। যেমন আধুনিক আরব রাষ্ট্রগুলো।

আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের কোনো অতীত উদাহরণ নেই। ফলে ইসলাম ও রাষ্ট্রের মধ্যকার সমঝোতার জন্য অতীতের কোনো মডেলও সম্ভবত নেই। এটা এমন এক ডিলেমা, যার কোনো সমাধান নেই। তাই ইসলামী নৈতিক কাঠামোই (যা এক সময় মুসলমানদের মধ্যকার ঐক্যবদ্ধতার সূত্র ছিল) এখন অন্যতম প্রধান একটি 'ইসলামী' দলের ট্রেডমার্ক হয়ে ওঠেছে। এই দলটি শুধু ইসলামপন্থাই নয়, স্বয়ং ইসলামের সাথেও সংশ্লিষ্ট। দলটি স্বভাবতই প্রথমে রাষ্ট্র ক্ষমতায় যেতে চাইবে। তারপর রাজনৈতিক ও মতাদর্শিক মেরুকরণকে প্রকট করে তুলতে পারে। এর ফলে মতাদর্শ, দল ও ক্ষমতা– একটি আরেকটির সাথে মারাত্মকভাবে জড়িয়ে গেছে। অবশ্য, এই ডিলেমা সম্পর্কে ইসলামপন্থীরা অসেচেতন নয়। আপনি যদি তাদেরকে প্রশ্ন করেন তারা সম্ভবত জবাব দেবে, স্থানীয় সরকারের ক্ষমতায়নকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আরো বিস্তৃত করা এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা দরকার। প্রকৃত পক্ষে, একবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে ব্রাদারহুড ঘরানার সংগঠনগুলো তাদের নানা ধরনের রাজনৈতিক প্লাটফরম ও নির্বাচনী ইশতেহারগুলোতে 'বিকেন্দ্রীকরণ' ধারণাকে পছন্দ করতে শুরু করেছে।*[৩৯]

[৩৯] * (অনির্বাচিত) কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের বিপরীতে নির্বাচিত স্থানীয় প্রতিনিধিদেরকে ক্ষমতায়নের মাধ্যমে একটি ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করার উপর মিশরীয় ব্রাদারহুডের স্পষ্ট অবস্থানের বিস্তারিত ও সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হচ্ছে ২০০৫ সালের নির্বাচনী ইশতেহারের 'অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ' সেকশনটি। ব্রাদারহুডের পরিকল্পনা অনুযায়ী, জাতীয় মন্ত্রীসভার কাজ

কিন্তু সবার আগে একটি শক্তিশালী, কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ ব্যতীত বিকেন্দ্রীকরণের মতো দুঃসাহসী কাজের বাস্তবায়ন কীভাবে সম্ভব, বিশেষ করে যখন এ ধরনের সর্বাত্মকবাদী রাষ্ট্র নিজেই নিজের ক্ষমতা খর্ব করার প্রসঙ্গ আসবে?

ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা ইসলামপন্থী ও সেকুলারদের মধ্যকার জটিলতাকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে। অধিকাংশ আরব দেশেই শক্তিশালী ও সুশৃঙ্খল দলীয় কাঠামোর অভাব রয়েছে। যদিও সেখানে গণতন্ত্রের পথ উন্মোচিত হচ্ছে। তারপরও বাস্তবতা হলো, সেখানকার রাজনৈতিক দলগুলো হয় খুব দুর্বল, নয়তো জনগণকে নামমাত্র রাজনৈতিক কার্যক্রমের সুযোগ দেয়া হয়। নিজেদেরকে একদম গোড়া থেকে গড়ে তুলতে নতুন দলগুলোর কয়েক দশক না হলেও কয়েক বছর তো লাগবেই। যদিও একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী আদর্শ ব্যবস্থা হিসেবে 'গণতন্ত্র', বিশেষ করে নির্বাচনকে মেনে নিতে কোনো কোনো গণতন্ত্রী আপত্তি করবেন। তাদের মতে, অন্তত জাতীয় পর্যায়ে নিছক নির্বাচনকেই অনির্দিষ্টকালের জন্য গণতন্ত্র মনে করা থেকে বেরিয়ে আসা উচিত। প্রচলিত অর্থে দল বলতে যা বুঝায়, মিশর ও তিউনিশিয়ার কোথাও ইসলামপন্থীদের সে ধরনের দল ছিল না। তবে আদর্শিকভাবে মজবুত আন্দোলন হওয়ায় তারা খুব সহজেই নিজেদেরকে দলে রূপান্তরিত করতে পারে। এক্ষেত্রে তারা হয় নতুন একটি সহযোগী দল গঠন করে (যেমনটা মিশরে হয়েছে), নয়তো এমন একটি নতুন ধারা তৈরি করে যেখানে দল ও আন্দোলন পরস্পর অবিচ্ছেদ্য (যেমনটা তিউনিশিয়ায় হয়েছে)। প্রথমবারের মতো অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত সংসদীয় নির্বাচনে সালাফী দলগুলোসহ ইসলামপন্থীরা সম্মিলিতভাবে মিশরে প্রায় ৭৫ শতাংশ এবং তিউনিশিয়ায় ৪১ শতাংশ আসনে জিতেছে। অন্যদিকে, বৃহত্তম সেকুলার দলগুলো মিলে যথাক্রমে ৭.৬ শতাংশ এবং ১৩ শতাংশ আসনে জয়লাভ করেছে। যে কোনো বিবেচনায়ই এটি বিশাল পরাজয়। এই ফলাফলের কারণে শুরুতেই নন-ইসলামিস্টদের জন্য গণতন্ত্র একটা অসুবিধাজনক ব্যাপার হয়ে ওঠার

হবে বৃহত্তর পলিসি ও কৌশল ঠিক করা; আর এগুলো বাস্তবায়নের দায়িত্ব থাকবে স্থানীয় সরকারের উপর। কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো অনুমোদন ব্যতিরেকেই স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নিজস্ব ভৌগোলিক সীমার মধ্যকার ট্যাক্স এবং বিভিন্ন ফি আদায়ের ক্ষমতা লাভ করবে। দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে জাকাত সংগ্রহের জন্যও তারা দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকবে। স্থানীয় সরকারের খরচের পর যদি কোনো উদ্বৃত্ত থাকে, তাহলেই কেবল তা রাজস্ব বিভাগে জমা করা হবে। ফাইনালি, মিউনিসিপ্যাল নেতৃবৃন্দের স্বাধীনতা যেন নিশ্চিত থাকে, সে জন্য বেসরকারী ফান্ডিং মেকানিজমের মাধ্যমে তাদের বেতন প্রদান করা হবে (আল-বারনামাজ আল-ইনতিখাবি লিল ইখওয়ান আল-মুসলিমিন ফিল ইনতাখাবাত আল-তাশরিয়্যাহ [সংসদীয় নির্বাচনে মুসলিম ব্রাদারহুডের নির্বাচনী ইশতেহার], কায়রো, নভেম্বর ২০০৫)।

ভীতি তৈরি হয়েছে। সংবিধান, রাষ্ট্র এবং পার্লামেন্টে ইসলামপন্থীরা যখন এতটাই দৃঢ় অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে, যা ভবিষ্যতে পরিবর্তন করে ফেলা বেশ কঠিন, সেকুলার ও লিবারেলরা তখন এইসব নিয়ে বলতে গেলে উদাসীন।

লিবারেল ও সেকুলারদের আরেকটা সমস্যা আছে। সম্ভবত এটা আরো বেশি মৌলিক সমস্যা। সেটা হলো, মোটাদাগে ইসলামপন্থীদের অপছন্দ করা ছাড়া মিশর ও তিউনিশিয়ায় 'লিবারেলিজম' বলতে তারা আদতে কী বুঝে, তা পরিস্কার নয়। ব্যাপার যাই হোক না কেন, তারা মূলত সমাজের সংখ্যালঘু অংশ, শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রগামী শহুরে এলিট। ইসলামপন্থীদের মতো লিবারেলদের শক্তিশালী সাংগঠনিক কাঠামো নেই। অন্যভাবে বললে, লিবারেলিজম কখনোই একটি জীবনব্যবস্থা হিসেবে কার্যকর ছিল না, কখনো হবেও না (লিবারেলিজম একজন ব্যক্তিকে তার নিজের মতো করে জীবনযাপন করার স্বাধীনতা দেয়। এর পরিণতি যাই হোক না কেন)। কারণ, লিবারেলিজম কী, অথবা কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ– সে বিষয়ে সাধারণ মানুষের কাছে এটি কোনো ইতিবাচক ভিশন তুলে ধরতে পারে না। লিবারেলদের স্বাধীন চয়েস খুব সামান্যই। বরং ইসলামপন্থার তীব্র বিরোধিতাই তাদের সারকথা। নন-ইসলামিস্ট দলগুলো আরব বিশ্বে খুব ভালো করছে না। বিভিন্ন ব্যক্তি, সিভিল সোসাইটি গ্রুপ এবং ছোট দলগুলো মিলে তারা যে বৃহৎ কোয়ালিশন গড়ে তুলেছে, সেখানে তুলনামূলকভাবে খুব কমই ঐক্যমত্য রয়েছে। এই দৃষ্টিতে দেখলে বলা যায়, তাদের এই ঐক্যবদ্ধতার ভিত্তি হলো এমন এক শত্রুকে চিহ্নিত করা যার অস্তিত্বই তাদেরকে বাধ্য করেছে এই শত্রু থেকে নিজেদের পার্থক্য গড়ে তুলতে। যদিও তা সাময়িক।

এর পরিণতি হলো নিজেদেরকে প্রান্তিক অবস্থানের দিকে ঠেলে দেয়া। নিজেদের অস্তিত্বের বৈধতা দিতে এবং নিজেদের সুশৃঙ্খল কোনো মতাদর্শ না থাকায় অভ্যন্তরীণ ঐক্য বজায় রাখার স্বার্থে নন-ইসলামিস্ট দলগুলো ইসলামপন্থী ও সেকুলারদের মধ্যকার বিভাজনের উপর অনেক বেশি জোর দিয়েছে এবং ক্রমে এই বিভাজনকে আরো শক্তিশালী করে তুলেছে। তাই বলা যায়, একবার ধর্মীয় ও মতাদর্শিক বিভাজন গেড়ে বসলে তা থেকে বেরিয়ে আসা খুবই কঠিন। ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত সিমুর লিপসেট এবং স্টেইন রোকেনের **Party Systems and Voter Alignments** শিরোনামের গবেষণামূলক বইয়ে তারা দাবি করেছেন, রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়া নাগরিকদের মধ্যে নানা ধরনের বিভাজন তৈরি করে, যা দীর্ঘস্থায়ী বিভাজনকে উসকে দেয়।[৪০] পাশ্চাত্যের অধিকাংশ গণতান্ত্রিক দেশে মতভেদের প্রধান ইস্যু যে অর্থনীতি।

[৪০] Seymour Lipset and Stein Rokkan, Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives (London: Free Press, 1967).

এটি কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়। আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতায় এটি হয়েছে। আর এখানেই রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। যদি বিশেষ কোনো দল লাইমলাইটে চলে আসে, তাহলে অন্যান্য দল থেকে তারা কীভাবে আলাদা, তা ব্যাখ্যা করার বিশাল একটা সুযোগ তারা পেয়ে যায়। রাজনৈতিক দলগুলোর অগ্রগতি নিয়ে বিদ্যমান একাডেমিক কাজগুলোর মূলকথা হলো, "দলগুলো নিজেরাই... দলের সিস্টেমের পরিবর্তন ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার মূল কারিগর।[৪১] কিংবা রাজনীতিবিজ্ঞানী নিক সিটারের ভাষায় বলা যায়, "দলগুলোর রয়েছে প্রভাবিত তৈরির ক্ষমতা।[৪২]

ইসলামপন্থী বনাম সেকুলার বিভাজন থেকে সেকুলারদের পাশাপাশি ইসলামপন্থীরাও লাভবান হয়েছে। এই বইয়ের আগের চ্যাপ্টারে আমরা দেখেছি, ইসলামপন্থা হচ্ছে ইসলামী আত্মপরিচয় সম্পর্কে কারো সচেতন দাবির উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠা একটি আধুনিক ধারণা। ইসলামী আত্মপরিচয় নিয়ে সংকট তৈরি হলেই কেবল এই পরিচয়ের উপর জোর দেয়া হবে। যদি ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ ভূমিকা প্রতিষ্ঠিত হয় (ঘানুশী, আবদুল ফুতুহ এবং অন্যান্য 'লিবারেল' ইসলামপন্থীরা আশা করছেন, এমনটা ঘটবে), তাহলে ইসলামপন্থীরা তাদের লেজিটেমেসির আসল কারণটাই হারিয়ে ফেলবে। এটা একটা ইতিবাচক ব্যাপারই হবে হয়তোবা। কিন্তু ইসলামপন্থীরা সম্ভবত একে নেতিবাচক দৃষ্টিতেই দেখবে। কারণ তারা মনে করে, ইসলাম এমন একটি ব্যাপার, যা ইসলামপন্থার গুরুত্ব ও সাংগঠনিক শৃঙ্খলাকে নিশ্চিত করেছে। নির্বাচনী তৎপরতার দিক থেকে দেখলেও বলা যায়, সমর্থকদের সমর্থন করার পেছনে ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

খেলাফত পরবর্তী সময় থেকে শুরু হওয়া টানাপড়েনের গোড়াতেই যেসব সমস্যা রয়েছে, ইসলাম ভারসাম্যপূর্ণ হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলে এসব সমস্যা আপনাতেই মিটে যাবে বলে আশা করা যায়। কোনো পরিস্থিতিতে মতাদর্শ যখন সংঘাতের মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তখন নাগরিকদের আদর্শিক বন্ধন শিথিল করাটা এক ধরনের সমাধান বটে। কিন্তু এটা কি বাস্তবসম্মত? প্রাক আধুনিক যুগে ইসলাম যেভাবে ঐক্যের সূত্র ছিল, আবারো তেমনটি হয়ে ওঠতে পারে– এ রকম মনে করাটা ইউটোপীয় চিন্তার কাছে নিজেকে আত্মসমর্পণ করারই নামান্তর। মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে

[৪১] Nick Sitter, "Cleavages, Party Strategy and Party System Change in Europe, East and West," Perspectives on European Politics and Society, volume 3 (2002), p. 448.

[৪২] Ibid.

সফল দুটি গণতান্ত্রিক দেশ তিউনিশিয়া ও তুরস্কে এ ধরনের উদ্ভট চিন্তার প্রতিফলন দেখা যায়। সেখানে সেকুলারাইজেশনের প্রভাব কিছুটা কমে গেলেও একে পুরোপুরি মুছে ফেলা যাবে না। উভয় দেশেই যথেষ্ট পরিমাণে সেকুলার এলিটরা রয়েছে। পাবলিক লাইফে ইসলামের ভূমিকা কতটুকু থাকবে, নিছক সেটি নিয়ে ইসলামপন্থীদের সাথে তাদের বিরোধ নয়। তারা বরং চায় ইসলামের কোনো ভূমিকা আদৌ না থাকুক। আমরা আগেই দেখেছি, যখন ইসলামী শক্তির পক্ষে বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং 'সবকিছু কব্জা করার' ক্ষমতাসম্পন্ন একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র হাতে পাওয়ার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, তখন আদর্শগত ও ধর্মীয় মেরুকরণ সম্ভাব্যতার পর্যায় পেরিয়ে অনিবার্য হয়ে ওঠে।

মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে ইসলাম ও ইসলামপন্থীদের প্রভাবশালী ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গণতন্ত্রের সাথে সাংঘর্ষিক নয় (যদিও লিবারেল গণতন্ত্রের সাথে তা কিছুটা সাংঘর্ষিক)। দিন শেষে কোনো না কোনো গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই গণমানুষের মতামতের প্রতিফলন ঘটে। সমাজের নানা পক্ষের মতাদর্শিক চিন্তার সাথে আমরা একমত হই বা না হই, গণতন্ত্র তা প্রকাশের সুযোগ করে দেয়। মতাদর্শিক বিভাজন যতদিন পর্যন্ত সত্যিকার ও অর্থপূর্ণ না হবে, ততদিন পর্যন্ত তুর্কি, তিউনিশীয় বা মিশরীয়দের মতাদর্শ থেকে দূরে থাকা উচিত। সাময়িকভাবে মতাদর্শকে এক পাশে সরিয়ে রাখা কিংবা নিজেদের স্বার্থকে মুখ্য মনে না করা (আন নাহদা যেমনটি করার চেষ্টা করছে) তুলনামূলকভাবে ভালো। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের ক্ষেত্রে এটি বড় ধরনের প্রতিবন্ধক। যদি 'গণতন্ত্র' সফল হয়, তা হতে পারে ইসলামপন্থীদেরকে কোনঠাসা করার মাধ্যমে কিংবা ইসলামপন্থীরা নিজেরাই তাদের ইসলামপন্থার ব্যাপারে আপসকামী হওয়ার ফলে। এমনটা হলে নিশ্চিতভাবেই তা হবে একটি ভঙ্গুর গণতন্ত্র।

অনুবাদ: মাসউদুল আলম